# কল্যাণী

রামকৃষ্ণ মিশন
ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন

# কল্যাণী

## রামকৃষ্ণ মিশন
## ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশন, রহড়া

বিশেষ সংখ্যা ঃ ৫৮

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০২০ - ২২

প্রধান উপদেষ্টা
অধ্যক্ষ, স্বামী নিরীশানন্দ

পত্রিকা সম্পাদক
অধ্যাপক, ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা উপসমিতির শিক্ষক সদস্য
অধ্যাপক, ড. মলয়েন্দু দিন্দা
অধ্যাপক, শ্রী তুষারকান্তি হালদার

শিক্ষার্থী সদস্য
শ্রী শুভ পোড়ে
ম্যাক্সিম কামাল

| | | |
|---|---|---|
| **প্রকাশ** | ঃ | দোলযাত্রা, ২০২২ |
| **প্রকাশক** | ঃ | স্বামী জয়ানন্দ<br>সচিব, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া |
| **প্রচ্ছদ পরিকল্পনা** | ঃ | স্বামী নিরীশানন্দ, অধ্যক্ষ |
| **অক্ষর বিন্যাস** | ঃ | উমা মুখার্জী |
| **মুদ্রণ** | ঃ | ইউনিক প্রিন্টিং<br>দূরভাষ ঃ ৯০৩৮৪৫৩৪৪৯ |

## কার্য নির্বাহক উপসমিতি ঃ ২০২১-২২

| | | |
|---|---|---|
| **সভাপতি** | ঃ | স্বামী নিরীশানন্দ, অধ্যক্ষ |
| **শিক্ষক-সংসদ সম্পাদক** | ঃ | ড. সঞ্জয় মিত্র |

## উপসমিতির আহ্বায়কবৃন্দ

| | | |
|---|---|---|
| **সাংস্কৃতিক কার্যাবলি** | ঃ | ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় |
| **ভর্তি পরীক্ষা, সময় নির্ঘন্ট ও** | ঃ | ড. সঞ্জয় মিত্র |
| **রেকর্ড** | ঃ | শ্রী সুব্রত কুমার সাহা |

## ছাত্রাবাস সমিতি

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যক্ষ** | ঃ | চেয়ারম্যান |
| **সদস্য** | ঃ | তিনজন ছাত্রাবাস সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট |

# RAMAKRISHNA MISSION BOYS' HOME

**P.O. Rahara, Kolkata - 700118 (West Bengal), INDIA**
**Phone : [STD-033] 2568-2850 & 3219, Secy.-2523-6116&7666[d]**
**[A Branch Centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah-711202]**


মার্চ, ২০২২

## শুভেচ্ছা

উজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারায় প্রকাশিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব্ এডুকেশনের মনন চর্চার বার্ষিক পত্রিকা কল্যাণ-এর ৫৮ তম সংখ্যা।

আজ মানুষ গড়ার শিক্ষা বড্ড প্রাসঙ্গিক, আদর্শ শিক্ষকই আশা-ভরসার স্থল এবং দৃঢ়তার প্রতীক। শিক্ষকদের সৃজনী ভাবনার প্রবাহ সমাজকে সার্থকতা দিতে পারে। 'কল্যাণ' তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সার্থক হোক এর প্রকাশ। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই।

সম্পাদক

# সূচিপত্র

## প্রাককথন

**ফিরুক চেনা ছন্দের দিন** ❍ ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ❍ ৫

## সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান

**ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যাত্রা - আমাদের কী শিক্ষা দিয়ে গেলেন** ❍ স্বামী জিতসঙ্গানন্দ ❍ ৯
**মা সারদার মাতৃভাব** ❍ রোহিত শর্মা ❍ ১১
**সতেরও মা, অসতেরও মা, সত্য জননী - মা সারদা** ❍ সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❍ ১৩
**ওড়িশার জগন্নাথ কেন্দ্রিক বিতর্ক ও জগন্নাথ সংস্কৃতির আলোকে একটি পর্যালোচনা** ❍ রাহুল রায় ❍ ১৭
**স্বামীজী ও নেতাজী** ❍ সুদীপ্ত দে ❍ ২১
**মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয়** ❍ ড. আদিত্য কুমার লালা ❍ ২৪
**বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা ঃ একালের চোখে** ❍ ড. নাড়ুগোপাল দে ❍ ৩৩
**চার ইয়ারি কথা ঃ এক চিরায়ত কথা** ❍ ড. মলয়েন্দু দিন্দা ❍ ৪০
**আদি পর্বে বাংলা সঙ্গীত** ❍ ড. পার্থ প্রতিম দে ❍ ৪৭
**স্মরণে মননে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার** ❍ ড. শ্রীতম মজুমদার ❍ ৫১
**বিদ্যালয় প্রসঙ্গ ঃ আজকের অবস্থান** ❍ জয়ন্ত মন্ডল ❍ ৫৫
**কোভিডের সময় দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা** ❍ শুভ পোড়ে ❍ ৫৭
**দেশভাগ পরবর্তী চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন মানুষের আলোআঁধারী জীবনচর্যা** ❍শুভদীপ মন্ডল ❍ ৫৯
**কৃষ্ণ গহ্বর (Black Holes)** ❍ প্রতীক কর্মকার ❍ ৬৫
**জৈব প্রযুক্তি বিজ্ঞানের আলোকে আধুনিক কৃষি** ❍ তন্ময় ঘোষ ❍ ৬৯
**রহস্যময় কণা গ্র্যাভিটন** ইন্দ্রনীল মজুমদার ❍ ৭২

## গল্প

**বহমান** ❍ প্রসেনজিৎ মন্ডল ❍ ৭৪
**শোক আকাশ** ❍ রঞ্জন দে ❍ ৭৬

## বিশেষ রচনা

**শিকার প্রসঙ্গ** ❍ কৌশিক বিশ্বাস ❍ ৭৮

## কবিতা

**খোয়াব** ❍ আশীষ গায়েন ❍ ৭৯

## নাটক

**করোনাসুরমর্দিনী** ❍ ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ❍ ৮০

**Moral values and Ultra modern generation** ❍ Arghya Kamal Das ❍ ৯২
**The beauty of love** ❍ Samrat Bisai ❍ ৯৪
**Science: In the Eyes of Swami Vivekananda** ❍ Swami Nirishananda ❍ ৯৫
**Sri Ramakrishana & Swami Vivekanada : Architect of Bharatmata** ❍ Maxim Kamal ❍ ১০১

# ফিরুক চেনা ছন্দের দিন

ফিনিক্স পাখির মতো মনে হলো বেঁচে উঠলাম। কলেজ প্রাঙ্গণে সবাই ফিরলাম আবার। সব্বাই কি ফিরে এলো! আমাদের অন্যতম প্রিয় সহকর্মী শ্রীসমীর চক্রবর্তী ফেরেননি তার প্রিয় কলেজে। অস্থায়ী কর্মী ছিলেন সমীর। কিন্তু ভালোবাসায়, আপনত্বে তার জায়গা একজন স্থায়ীকর্মীর চেয়ে কম ছিলো না এতটুকু। তার চঞ্চল উপস্থিতি প্রাণ সঞ্চার করতো কলেজের দৈনন্দিন জীবনে। সেই সমীর চক্রবর্তী ফিরলেন না। করোনাতে চলে গেলেন অকালে। নিঃসন্তান সমীরের বাড়িতে এখন অসহায় স্ত্রী। একা কোন ধরনের সামাজিক আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে বেচারা এখন বেঁচে আছেন কে জানে! নিরন্তর এত মৃত্যু, এত যুদ্ধ, এত অঝোর অশ্রু আমরা দেখিনি কখনো। মহামারীর করাল দংষ্ট্রার ললিহান জিভ দেখে আতঙ্কে ভয়ে চাপা আর্তনাদে খান খান হয়ে যাওয়া সময় কখনো দেখিনি কেউ। একটা বড়ো সুনামি যেমন সমুদ্রের সাজানো বেলাভূমি একেবারে ছারখার করে দেয়, ঠিক তেমনি অদৃশ্য মারণ দস্যুর তাণ্ডব তছনছ করে দিয়ে গেছে আমাদের নৈমিত্তিক চেনা দিনকাল। ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব শখ আহ্লাদ, বেঁচে থাকার রুটি রুজি, পড়াশুনা, চাকরিবাকরির প্রস্তুতি, সব ওলোটপালোট হয়ে গেছে এই ক'দিনেই। রোজগার হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ। পড়াশুনার পাট গুটিয়ে দিয়ে একশো দিনের কাজে যাচ্ছে বাংলার গাঁ গঞ্জের অসংখ্য ছেলে। রেশন দোকানে ফ্রী তে চাল গমের সামান্য সংস্থানের জন্যে পেটপোড়া মানুষের লম্বা লাইন। ঈশ্বর মুখ ফিরিয়েছেন যেখানে, সেখানে যেন সরকারী দান কিংবা ভিক্ষান্নই ভরসা গরীব নিম্নবিত্ত মানুষের। ভাইরাস রেয়াত করেনি কাউকেই। সমগ্র বিশ্ব হাহাকার করতে করতে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে কখন। গল্পকথার মতো মনে হয়। প্রাণদায়ী ওষুধের আবিষ্কার ও অগ্রাধিকারের জন্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্বজুড়ে যেন যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল এই কদিন আগেই। অবশেষে ভ্যাক্সিন এলো। দুটো ডোজ সেরে নিয়েছে অনেকে। মনের মধ্যে সাহস ফিরেছে অনেকের। যতই এ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন বাজুক অহরহ, বিশ্বাস এসেছে, আর হয়তো বেঘোরে মরবো না ভ্যাক্সিনের জোরে। জীবন নিয়ে এই কল্পিত সাহসের ইন্ধন বুকে নিয়ে রাস্তায় আবার নেমেছে মানুষ। অনেকেই বেপরোয়া। মুখে মাস্ক, পকেটে স্যানিটাইজারের শিশি রাখার দায় যেন ঝেড়ে ফেলতে চায় দ্রুত। পরাধীন হয়ে বাঁচবে কে! ওদিকে নতুন ভাইরাস ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের ভয়ঙ্কর গর্জন নানা দিকে। লকডাউন শুরু হল আবার। ওমিক্রন ঢুকে পড়েছে। মৃত্যুর মিছিল থেমে নেই। শঙ্কা জাগছে, আমরা কি অহরহ উন্মাদের মতো এই মৃত্যুভয় নিয়েই লড়ে যাবো পৃথিবীতে! অনেকগুলো শব্দ শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে এই দুবছরে। সবাই জেনে গেছে, যার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিলো, সেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এখন খুব ভালো শব্দ। সবাই জেনে গেছে বাঁচতে গেলে মানুষকে একা হতে হবে। একদম একা। একা একা বদ্ধ ঘরে দুঃস্বপ্নের কালো অন্ধকারে জীবনের নতুন স্বরূপ দর্শন করতে হবে এবার! সমাজবদ্ধ জীবকে সবাই শোনাচ্ছে, সামাজিক দূরত্ব নিয়ে বাঁচতে হবে এবার। দূরত্ব নিয়েই বাঁচো। শারীরিক দূরত্বের নামে ঢুকে পড়েছে বিচ্ছিন্নতা। মারণ বিচ্ছিন্নতার প্রথম ধাপ। মানুষ মুখস্থ করে ফেলেছে, এমন কি শিশুরাও, কোভিড, কন্টেইনমেন্ট জোন, আইসোলেশন, পিপিই, কোয়ারেন্টাইন, আরটিপিসিয়ার, হার্ড ইমিউনিটি, লকডাউন, মাইক্রো কন্টেনমেন্ট, হ্যান্ড ওয়াশ, স্যানিটাইজার, এন নাইন্টি ফাইভ, ফেসশিল্ড এমন কত শব্দ। জীবনদায়ী শব্দ যেন! কতকগুলো ওষুধ শুধুমাত্র গুজবের ঝড়ে দোকান থেকে রাতারাতি শুন্য হয়ে গেছে। শুধুমাত্র যে কোনো মূল্যে প্রাণ নিয়ে টিকে যাওয়ার, প্রাণবাজিতে জিতে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টায়, মৃত্যুভয়ে, গুজবে মানুষ বাজার থেকে হাওয়া করে দিয়েছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, ডক্সিসাইক্লিন, জিঙ্কোভিট, ডেটল এ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সব। রাতারাতি। হন্যে হয়ে ঘুরেছে প্রাণ ভয়ে ভীত লোকজন দোকানে দোকানে। কালোবাজারি হয়েছে বিপুল ভাবে এই সব মেডিকেল পণ্যের। শরীরের অক্সিজেন মাপার ছোট্ট ডিভাইস পালস অক্সিমিটার বাজারে হঠাৎ নতুন আবির্ভূত হয়ে, আতঙ্কের বাতাসে উন্মাদ চাহিদা ভাসিয়ে দিয়েই রাতারাতি হাওয়া। লাইন দিয়ে দোকানে দোকানে মানুষ মাথা কুটেছে একটা অক্সিমিটারের জন্য, যত দাম নেয় নিক। অক্সিজেন নেই। সিলিন্ডারের জন্য হাহাকার। সেও মজুত করে নিয়েছে এক শ্রেণির চতুর লোক। করোনা পেসেন্ট মরছে অক্সিজেনের অভাবে। কোথাও মিলছে না

এতটুকু আশ্বাস। বিকার নেই কোথাও। ন্যায় নীতির ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে যে যেমন করে পারে জৈবিক শরীরটা নিয়ে যেন বেঁচে থাকাটাই সব। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন কোভিড যোদ্ধা ডাক্তার নার্সদের সম্মান দিতে হবে। জাতির উদ্দেশ্যে আবেদন, একদিন বিকেল পাঁচটার সময় সূর্য ডোবার আগে থালা বাসন কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে শঙ্খ ধ্বনি করে অভিবাদন জানাবে মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ সে সব করেছেন। প্লেন থেকে পুষ্প বৃষ্টি করা হলো চিকিৎসা কেন্দ্রের মাথায় মাথায়। এ সবই হলো, কিন্তু যে সব কোভিড যোদ্ধা ডাক্তার বা নার্স প্রাণভয় উপেক্ষা করে কোভিড ডিউটি করছিলেন হাসপাতালে, চিকিৎসাকেন্দ্রে দম আটকানো পিপিই কিটে শরীর মুখ ঢেকে, তাদের অনেককেই নিষ্ঠুর ভাবে বের করে দেওয়া হলো তাদের বাসা থেকে। সংক্রমণ ছড়িয়ে যাবার ভয়ে তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় জুটলো না নিজের পাড়ায়, নিজের বাসায়। থালাবাসন বাজিয়ে শঙ্খ ধ্বনি করে কোভিড যোদ্ধা ডাক্তার নার্সদের সম্মান অভিবাদন জানানো সেইসব চেতনাবান মানুষেরাই তাদের বের করে দিয়েছেন পাড়া থেকে। ঘর থেকে। যে সব হতভাগ্য পরিবার কোভিড আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি, যাদের শেষ পর্যন্ত কোভিড ঢুকে পড়েছে বাড়িতে, তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। তাদের অবস্থা হয়েছে অপরাধীর মতো। চোরের মতো। কোয়ারেন্টাইনে বাড়ি থেকে বেরোনো বারণ। খাবার, দৈনিকের ব্যবহার্য জিনিসপত্র, এমন কি অতি প্রয়োজনের ওষুধটুকুও দোকান থেকে এনে দেবার কোনো লোক নেই। এতদিনের চেনা বন্ধুবান্ধব, লোক দেখানো আত্মীয় স্বজন সব পিঠটান দিয়েছে। পালিয়েছে। এখন আর চেনে না কেউ। খবর নেয় নি কেউ। পাছে কোনো সাহায্য চেয়ে বসে সেই ভয়ে। করোনা রোগীর বাড়ির বাকি হতভাগ্য মানুষগুলোর পেটে দানা পানি পড়বে কী ভাবে জানে না কেউ। রাতের অন্ধকারে বেরিয়েছে সেই সব বাড়ির মানুষ, লুকিয়ে লুকিয়ে চুপিসাড়ে চোরের মতো। কোভিডে মরে যাবার আগে না খেয়ে মরতে চায় না কেউ। মরতে পারেও না কেউ। কোনো কোনো জায়গায় কিছু কিছু সংগঠন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও তা ভীষণ নগণ্য। হতভাগ্য পরিবারের কেউ মারা গেলে সেই বাড়ির দশা বর্ণনার অতীত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থেকেছে মৃতদেহ, তা সে কোভিড হোক আর নাই হোক। মৃতদেহ ছোঁবে না কেউ। তাও শহরাঞ্চলে কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা না হয় শেষমেশ হয়েছে, কিছু শহুরে মানুষের বিবেক সুলভ্য সেখানে কোথাও কোথাও। কিন্তু অধিকাংশ গণ্ডগ্রামের দিকে এমন মৃত্যু হলে পরিবারের বাকি যারা আছে, তা সে শিশু হোক মহিলা হোক বৃদ্ধ হোক, তাদেরকেই হাত লাগিয়ে কোনো রকম ভাবে টানতে টানতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে হয়েছে শ্মশানে। সাহায্যে এগিয়ে আসে নি কেউ। সাধারণ রোগজ্বালাতেও এখানে চিকিৎসা পায় নি মানুষ। কোনো রোগেরই চিকিৎসা নেই। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারবাবুরা আতঙ্কে চেম্বার বন্ধ করে দরজায় তালা মেরে দিয়েছে। অন্য কোনো রকমের শরীর খারাপ হলেও এখন কেউ মুখ খোলে না পাড়ায়, একঘরে হয়ে যাবার ভয়ে। সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। উত্তর চব্বিশ পরগণা কলকাতার শ্মশানে সাদা প্লাস্টিক মোড়া মৃতদেহের লাইন। মৃতের বাড়ির লোকেদের কপালে জোটে না শেষ যাত্রায় প্রিয়জনের মুখটুকু দেখারও অধিকার। লকডাউনের রাতে সব মৃতদেহ কি পুড়েছে! নাকি কবরস্থ হয়েছে! নাকি মৃতের কপালে জুটেছে অজানা হাড়হিম কোনো গতি, জানে না কেউ। উদ্ধারিণী মা গঙ্গার স্রোতেও ভেসে গেছে অসংখ্য কোভিডের লাশ। এ সবই ঘটে গেছে এই দুবছরের অন্ধকার ইতিহাসে। এ সব আগে কবে দেখেছে মানুষ! হাঁচি কাশি সামান্য জ্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার জেনে এসেছে এতদিন সবাই, সেই কোন জন্ম থেকে। আজ করোনাকালে সেই সামান্য হাঁচি কাশি সর্দি মানে অপরাধ। পরিত্যজ্য। জ্বর হলে সে অচ্ছুৎ। আলাদা ঘর। জানালা বন্ধ। দরজা বন্ধ। অন্ধকার বায়ুশূন্য কক্ষে কাটবে অনিশ্চিত সময়। চিকিৎসাহীন, যত্নহীন, স্নেহস্পর্শ হীন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকার লড়াই। যেদিন প্রথম লকডাউন ঘোষণা হলো, সেদিন বাজার থেকে চাল আলু ডাল চিনি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সব উধাও হয়ে গেছে। রাতারাতি যে যতটা পারে সব বোঝাই করে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে আতঙ্কে। আরও বেশি কিছু দিন সুকৌশলে বেঁচে থাকার পাকা পোক্ত হিসেব! প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়। আগে জান বাঁচান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছেন, প্যানিক করবেন না। সরকার সর্বতো ভাবে আপনাদের পাশে থাকবে। থানা থেকে মাইকিং হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, কেউ অতিরিক্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করবেন না। কে কার কথা শুনবে তখন! কোন ভরসায় কোন আশ্বাসে সাড়া দেবে মানুষ! স্তব্ধ দিন। স্তব্ধ রাত্রি। শুনশান জনশূন্য রাস্তাঘাট। মৃত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ যেন ভৌতিক কণ্ঠে হিসিহিসিয়ে উঠছে দমকা বাতাসে। ঘরের বাইরে বের হওয়া নিষেধ। বাইরে কাউকে দেখলেই মুখ ঢাকা পুলিশে লাঠি দিয়ে পেটায়। নির্মম ভাবে পেটায়। পেটের দায় শোনেনা পুলিশ। সরকারি নির্দেশ মেনে তারা লাঠির বাড়ি মেরে মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দেয় বেপরোয়া মানুষকে। ভুতুড়ে

প্রেতলোকের রাস্তায় দু তিনটে নেড়ি কুকুর এলোমেলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমোয় সারাক্ষণ। তারা দিশেহারা নিশ্চুপ। রাস্তার এই সব প্রাণীগুলির খাবার জোটেনি বহুদিন। নিষ্প্রাণ নেতিয়ে পড়ে থাকে তারা শূন্য রাস্তায়। ধুলো ওড়ে দমকা বাতাসে। আকাশে কাক চিল চক্কর দেয় ঘন ঘন। ফেসবুক হোয়াটস্যাপের বদ্ধ ঘরে জেগে থাকে আতঙ্কিত ভরসাহীন মানুষ। শিশুরাও থমকে গেছে। ভুলে গেছে তাদের স্বাভাবিক খেলাধুলা, কলরব। ভয়ার্ত চোখে মায়ের আঁচলের তলায় মুখ ঢেকে উৎকণ্ঠিত স্বরে মাকে প্রশ্ন করছে তারা, মা আমরা কি একসঙ্গে সবাই মরে যাবো? কেউ বাঁচবো না মা? কী উত্তর দেবে মা! সন্তানের মুখ চেপে ধরে ডুকরে ওঠা কণ্ঠে সাহস দেয় মা, এসব বলতে নেই বাবা। একদম বলতে নেই। কিচ্ছু হবে না আমাদের দেখিস। আমরা ঠিক ভালো থাকবো। ঠিক ভালো থাকবো।

পড়াশোনা নেই বাচ্চাগুলোর বহুদিন। লকডাউনে স্কুল কলেজ বন্ধ। বন্ধ খেলাধুলা। বন্ধ টিভি দেখা। টিভিতে দিনরাত্রি শুধু অজস্র মৃত্যুর পরিসংখ্যান আর আতঙ্কে অসাড় করে দেওয়া মৃত্যুমিছিলের ছবি। এই প্রথম সান্ধ্য টিভির পর্দা জুড়ে অনবরত কোনো রাজনৈতিক স্থূল বাকবিতণ্ডা শোনা যাচ্ছে না কিছু মাস। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যাব স্মার্ট ফোন দেবার যুগান্তকারী ব্যবস্থা করেছেন। খুশির হাসি ফুটেছে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় থাকা গরীব বাবা মায়ের মুখে। শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাস। গুগল মিট, গুগল ক্লাস রুম, জুম ইত্যাদি অ্যাপসে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার নতুন ব্যবস্থা। শহরাঞ্চলে এই নতুন ব্যবস্থা যে কিছুটা পরিমাণে সফল হয় নি তা নয়, দায়িত্বশীল ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা যেখানে, সেখানে কিছুটা ভালো কাজ হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামের দিকে কিচ্ছু হয় নি। নো ক্লাস। নো পড়াশুনো। হাতে একটা ফোন এসেছে বটে, কিন্তু এ ভাবে পড়ালেখাতে মন বসে নি।গ্রামাঞ্চলে নেট পাওয়াও দুষ্কর। শুধু স্কুলে সরকারি নির্দেশানুসারে অভিভাবকদের ডেকে লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে মিডডে মিলের চাল ডাল বিলির সঙ্গে ঘরবন্দি থাকা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার টাস্ক দেবার নামে প্রহসন বিলি হয়েছে বছরভর। আসলে এ ভাবে কিছু হবার নয়। মানসিক সান্ত্বনাটুকু ছাড়া। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক অনলাইন হোক কি সেন্টারে গিয়ে হোক পরীক্ষাটাই না নেওয়ার পক্ষে সরকার নির্দেশিত গণভোটে রায় দিয়েছে অধিকাংশ মানুষ। শিক্ষাদপ্তর গণতান্ত্রিক রায় মেনে ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম এই দুটো বড়ো পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে বিকল্প উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। একটা বড়ো অংশের ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নেমে ভোট জেতার মতো করে উল্লাস প্রকাশ করেছে এই সিদ্ধান্তে। অন্যদিকে পড়াশুনা করে পরীক্ষার জন্যে রীতিমতো তৈরি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের একটা শ্রেণি গুমরে কেঁদেছে মুখ গুঁজে। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে এইসব অসাম্য মেনে নিতে হয়। কীই বা করার থাকে! ফেসবুকে বসে ফোঁস ফোঁস করে দুর্বল কিছু মানুষ। সভ্যগব্য নেটিজেনদের একটা বড়ো অংশ সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে রোম্যান্টিক কাব্য চর্চার বন্যা বইয়ে দেয় ফেসবুক ইন্সটাগ্রামের পাতায়। আর একটা অংশ চটুল চুটকির ফুলকি ছড়ায় নেটের বাতাসে। দেশ জুড়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবিনারের ছয়লাপ। ইন্টেলেকচুয়্যাল বক্তারা মনস্তত্ত্বধর্মী পাণ্ডিত্যের একঘেয়ে ধারাপাত বর্ষণ করে চলেছেন অহরহ। সার্টিফিকেটকামী অগণিত ঢুলচোখ ছাত্র ছাত্রী গবেষক শ্রোতার ক্লান্ত কান মন ভরিয়ে বক্তারা সুদীর্ঘ কর্কশ রচনা পাঠ করে, বক্তৃতা করে, পাওয়ার পয়েন্ট পরিবেশন করে বলে চলেছেন, মহামারীর আবহে শিশুদের কী কী মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হতে পারে, তাতে বাবা মা পাড়াপড়শিরা কী করবেন, নেট নির্ভরতার কারণে শরীরে কোন কোন রোগ অনিবার্য হয়ে উঠতে চলেছে! ডিপ্রেশন এবার কেমন মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ছাত্র ছাত্রী পার্টিসিপেন্টস শ্রোতা এসব শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। ওয়েবিনারের মেসেজ বক্স ভরে ওঠে উপর্যুপরি পংক্তিতে, ফিডব্যাক ফর্ম প্লিজ, ফিডব্যাক ফর্ম প্লিজ। ফিডব্যাক ফর্মটা পূরণ করা হয়ে গেলেই ছুটি। কেটে পড়া যাবে নিশ্চিন্তে। এই এক ভঙ্গিতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসও হলো অনেকগুলো দিন। অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত স্টুডেন্টদের মধ্যে কে যে ছায়া আর কে যে কায়া, কে থাকলো আর কে যে থাকলো না, সেই সব সংশয় মাথায় নিয়েই ফোনের পর্দায় চোখ রেখে লেকচার দিয়ে গেলেন শিক্ষক শিক্ষিকা। আক্ষেপ তাদের বুকে। হৃদয়ে। পরীক্ষার কোনো চাপ নেই। করোনার দিনকালের দোষ ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে এসে পড়বে কেন! প্রহসনের জগতে ওদিকে ভ্যাক্সিন এসে গেছে তত দিনে। প্রথম দিকে বুদ্ধিমান মানুষের সংশয়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলোকে নতুন আবিষ্কৃত ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য গিনিপিগের ভূমিকা পালন করাবে না তো? ভয়ে খুব একটা এগোয়নি কেউ প্রথম দিকে। সরকারি ভ্যাক্সিন সেন্টারগুলো মাছি তাড়িয়েছে। সংক্রমণের প্রথম ঢেউ স্তিমিত তখন। রাজ্যের মানুষ দিব্যি বিধান সভার ভোট নিয়ে মাতামাতি করেছে সর্বত্র। যখন দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে

পড়লো করোনার, পাড়ায় পাড়ায় ছেয়ে গেল অসুস্থতার ঘন কালো মেঘ, মৃত্যুর পর মৃত্যুর যখন আছড়ে পড়ছে উপর্যুপরি ঢেউ, রাস্তায় অনবরত অ্যাম্বুলেন্সের গগনভেদী সাইরেন আওয়াজ আতঙ্কে কাঁপিয়ে দিচ্ছে বুক, অক্সিজেনের একটা সিলিন্ডারের জন্য হাহাকার চতুর্দিকে, তখন টনক নড়েছে মানুষের। ভ্যাক্সিনের জন্য খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শুরু হলো পাগলের মতো ছোটাছুটি। যে করে হোক বাঁচবার জন্যে ভ্যাক্সিন চায়। সরকারি হেলথ সেন্টার গুলোর চার প্রহর রাত জাগা লাইনের পর লাইন। ঠেলাঠেলি অবিশ্বাস্য ভিড়। ভ্যাক্সিনের ওই চাপাচাপি লাইনগুলো তখন হয়ে উঠেছে করোনা ছড়ানোর অপূর্ব মাধ্যম। লাইনে দাঁড়ালেই যে ভ্যাক্সিন জুটছে তা নয়। কখনো উপছে পড়া লাইন শেষ হওয়ার অগেই ভ্যাক্সিন শেষ। ভিড় দেখে প্রাণভয়ে পালিয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীরা। শুরু হলো ভাঙচুর মারামারি। ঠেলাঠেলি। হাতাহাতি। পুলিশ লাঠিচার্জ করে সামাল দেয় জীবন বাঁচাতে আসা উন্মাদ মানুষের বিশৃঙ্খল আস্ফালন। অন্যদিকে, এক প্রান্তে শুরু হয়ে গেছে ভিন্ন রাস্তা ধরে কোনো ভাবে একটা ডোজ ম্যানেজ করে নেওয়ার চিরাচরিত দুনম্বরী কালচার। ক্ষমতাশালী হোমরা চোমরা কেউ পরিচিত থাকলে একটা লাইন ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। কিছু হাতে ধরিয়ে দিলে কাজও হচ্ছে কোথাও কোথাও। সেই পথেও উদ্ধার হয়েছে অনেক প্রাণপ্রার্থী মানুষ। রাত্রি থেকে লাইন ধরে রাখার জন্য ভাড়া খেটেছে গরীব ঘরের ছেলে। মরণপণ এই হুড়োহুড়ির মধ্যে অজানা অচেনা ভুয়ো সংস্থা থেকে ভুয়ো ভ্যাক্সিন নিয়ে তৃপ্তিতে বাড়ি ফিরে পরদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রেখে চোখ কপালে উঠেছে কারোর, যে ভ্যাক্সিন শরীরে গেলো সেটা নকল! বিপদ ঘটে যাবে না তো! বৃদ্ধ বৃদ্ধা এমন কি শিশুদের শরীরেও ঢুকেছে ভেজাল ভ্যাক্সিন। ভাগ্য ভালো, গ্রেফতার হলো এমন কিছু মানব দস্যু। কয়েক মাস কেটে গেল। করোনা পর্বের দ্বিতীয় ঢেউএর মৃত্যু ও সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী হলো। ভ্যাক্সিন ব্যবস্থাও স্বাভাবিক হলো অনেকটা। কিন্তু বিপদ ছেড়ে যায় নি আমাদের। এই সবের মধ্যেই সরকারি নির্দেশে আমরা সাহস আর ঘরে ফেরার আনন্দ নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম আবার। এই দুঃসময়ের মধ্যে অধুনা প্রাক্তন, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী কেদারাত্মনন্দ মহারাজ অসুস্থ হয়েছেন। তিনি অবসর নিয়েছেন তাঁর দায়িত্ব থেকে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ব্যাপী ছিল তাঁর কঠোর ও কোমল নীতিনিষ্ঠ কর্মকালের আশ্বাসী জীবন। অধ্যক্ষের আসনে নতুন দায়িত্বে যোগদান করেছেন নব্যতারুণ্যের দীপ্তিতে, শক্তিতে উজ্জ্বল কর্মচঞ্চল স্বামী নিরীশানন্দ মহারাজ। ভয় কাটিয়ে ছাত্রেরা ফিরছে কলেজে। ছাত্রাবাস সেজে উঠছে নতুন করে। মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ অসম্ভব ঝলমল করছে নতুনের আঙ্গিকে। এ যেন নতুনের প্রতিশ্রুতি। নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। শ্রী শ্রী ঠাকুর মা স্বামীজী আমাদের শক্তি। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয়। তাঁদের আশীর্বাদে ক্লান্ত বিশ্বে আবার শান্তি ফিরুক। ফিরুক আবার সেই চেনা ছন্দের দিন।

**কৌশিক চট্টোপাধ্যায়**
**পত্রিকা সম্পাদক**
**রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব**
**এডুকেশন, রহড়া, কলকাতা - ১১৮**

# ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যাত্রা - আমাদের কী শিক্ষা দিয়ে গেলেন

**স্বামী জিতসঙ্গানন্দ**
**অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন, পি.টি.টি.আই (রহড়া)**

বেদে আছে - 'সত্যং বদ। ধর্মং চর'। অর্থাৎ সত্য কথা বলো। ধর্ম আচরণ করো বা ধর্ম পালন করো। এখানে অনেক প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে ভিড় করে। যেমন - সত্য কী? কোনটা সত্য? সত্য কথা কেন বলবো? যেখানে মিথ্যা কথা বললে আমার লাভ হবে এবং শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবো বা মিথ্যা কথা বললে আমার অনেক অর্থ উপার্জন হবে, সেখানে কেন সত্য বলতে যাবো ইত্যাদি।

অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন - 'সত্য কথা কলির তপস্যা, যে সত্যকে ধরে আছে - সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।' আরো বলেছেন - 'সত্যে আঁট থাকার দরকার।' তিনি যে শুধু উপদেশ দিয়েছেন তা নয়। নিজের জীবন দিয়ে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে সত্যকে ধরে থাকতে হয় এবং সত্য পালন করতে হয়। পাঠকবর্গের মনে হতে পারে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো ভগবান, তাই সত্যকে ধরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তিনি তো ভগবান ছিলেন না! তিনি কি করে সত্যকে ধরে রাখলেন? ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলেই ভগবানকে নিজের সন্তান রূপে পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষেরা তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা, ভক্তি করতেন। তিনি আসছেন দেখলেই রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াতেন, তিনি স্নান করতে নামলে অন্যরা জল থেকে উঠে অপেক্ষা করতেন। তাঁর স্নান করা হলে - জলে নামতেন। আবার এই সত্যকে ধরে থাকার জন্য যেমন জমিদারের হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্য, - জমি, জায়গা, ভিটে-মাটি, এমনকি গ্রাম থেকে বিতাড়িত পর্যন্ত হয়েছেন, তবুও তিনি সত্যকে ছাড়েননি অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলেননি। সত্যকে ধরেছিলেন বলেই, তিনি ভগবানকে নিজের সন্তান রূপে লাভ করেছেন। মা শীতলাদেবী তাঁর সঙ্গে থাকতেন, যখন তিনি ভোরবেলাই ফুল তুলতেন, তখন মা শীতলাদেবী বাচ্চা মেয়ের রূপে ফুল গাছের ডাল নুইয়ে ধরে ফুল তুলতে সাহায্য করতেন। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রূপে বহু দেব-দেবীর দর্শন লাভ করেছেন এবং মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল করেছেন।

এবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আসা যাক - 'ঠাকুর সত্যকে ধরেই মা ভবতারিণীকে জাগ্রত করলেন, মায়ের দর্শন পেলেন। একবার দু-বার নয়, অনবরত। ইচ্ছা মাত্রেই মাকে দেখতে পেতেন, মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন, সমস্ত কাজে মা ভবতারিণীর অনুমতি নিতেন। তিনি কিভাবে সত্য পালন করতেন - তার দু একটি ঘটনা এইভাবে বলা যেতে পারে। তিনি - যে কথা মুখে বলতেন এবং মনে মনে যা সংকল্প করতেন, তা পালন করতেন। যদি ভাবতেন বাহ্যে যাবো তাহলে বাহ্যে না পেলেও ঝাওতলা থেকে ঘুরে আসতেন গাড়ু হাতে করে। একবার যদু মল্লিককে কথা দিয়েছিলেন 'তোমার বাড়ি যাবো'। কোন কারণে সে কথা ভুলে গেছেন। যদু মল্লিকের বাড়ি যাওয়া হয়নি, রাত্রে বেলায় মনে পড়েছে - তাঁর বাড়ি যাওয়া হয়নি। তখন সবাই শুয়ে পড়েছে। কী হবে? কী করে সত্য রক্ষা হবে? সত্য রক্ষার জন্য সেই রাত্রে - যদু মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে পা গলিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে বললেন - 'এই তোমার বাড়িতে আসা হল' বলে সত্য রক্ষা করলেন।

ধর্মই ভারতের সর্বস্ব। ভারত ও অন্যান্য দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করলে, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু সকলকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত নিজ সর্বস্ব নিয়োজিত করেছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করেছে।

শ্রীভগবানের দর্শন লাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, একথা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্মস্থাপক আচার্যগণকে বৈদিক যুগ থেকে আমরা সে সকল পর্যায়ে নির্দেশ করেছি। সে সকল অভিধার অর্থ অনুধাবন করলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হবে, যথা -- ঋষি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি লীন পুরুষ ইত্যাদি। যাঁরা অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করে অসাধারণ শক্তির পরিচয়

প্রদান করেছিলেন তাঁরাই ঐ সকল নামে নির্দিষ্ট বা অভিহিত হয়েছিলেন, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বৈদিক যুগের ঋষি থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগের অবতার-প্রথিত পুরুষ সকলের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত কথা বা উপাধি সমভাবে প্রযোজ্য।

এখানে প্রশ্ন হল - সকলকে একই (ঋষি) নামে অভিহিত করা হল না কেন? কারণ বৈদিক যুগে মানুষেরা কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ সকল দর্শন করতে সমর্থ বলে বুঝতে পারলেও, তাঁদের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করতে পারেননি। তারা প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি' - পর্যায়ে নির্দেশ করেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কালে মানুষের বুদ্ধি ও তুলনা করার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল, ততই মানুষ উপলব্ধি করতে লাগলো - ঋষি সকলে সর্বশক্তিমান নন্। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁদের মধ্যে কেউ সূর্যের ন্যায়, কেউ চন্দ্রের ন্যায়, কেউ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, আবার কেউ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তি প্রদান পূর্বক জ্যোতিষ্মান হয়ে আছেন। তখনই মানবের মন, তাঁদের মধ্যে শক্তির তারতম্য অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করতে লাগলেন। ঐভাবে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষিকে 'অধিকারী পুরুষ' পর্যায়ে অভিহিত করলেন। আবার কেউ কেউ - 'প্রকৃতি লীন পর্যায়ে চিহ্নিত হলেন। পরবর্তীকালে আরো অনেক উপাধি নির্দিষ্ট হয়েছে - শক্তির তারতম্য অনুসারে। থাক সে কথা। এখন আমাদের কর্তব্য কি? কিভাবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হবো?

মনুষ্য জীবনের যে উদ্দেশ্য - সেটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সহজ করে বললেন - 'মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।' অন্য কোনো সুখকর ভোগ্য বস্তুর কথা একবারেও বলেননি। কিভাবে ভগবান লাভ করা যাবে, কোন কর্ম কিভাবে পালন করতে হবে, আমাদের আচরণ কেমন হবে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিভাবে চলতে হবে - তবে মানুষ তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাবে, আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি করে পরমানন্দকে লাভ করবে - সেই পথ দেখানোর জন্যই ঈশ্বর যুগে যুগে নবরূপ ধারণ করে জগতে নেমে আসেন। মানুষকে পথ দেখাতে। যেমন - শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামচন্দ্র, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি। এখানে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে - যদি একই ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে আসেন - তাহলে একবার এলেই তো হোত, বারে বারে আসার কী দরকার? ঠিকই, কিন্তু বারে বারে আসার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং আছে - সে কথা একটু চিন্তাভাবনা ও সাধন ভজন এবং তুলনামূলক বিচার করলে বোঝা যায়। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব - কতবার কত উপমা দিয়ে বলেছেন, তা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পড়লে বোঝা যায়। তিনি নিজ জীবনে পালন করে দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন 'কলিতে অন্নগত প্রাণ'। তাই অন্ন না খেলে শরীর সাধন ভজনে সক্ষম হবে না। সত্যযুগে মানুষ শুধু ফল মূল খেয়েই জীবন ধারণ করতে পারতেন। বর্তমান যুগে কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাই তাঁকে বারে বারে এসে নতুন নিয়ম এবং নতুন ভাবে ধর্ম আচরণ করতে নির্দেশ করেন।

# মা সারদার মাতৃভাব

**রোহিত শর্মা**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

দেবীশক্তি ও মাতৃশক্তির সম্মিলিত ভাব ও প্রকাশ যার মধ্যে, যার মাতৃভাব ও স্নেহ, ভালোবাসা আজও জগৎসংসারে তাপিত ও পীড়িত মানুষদের পথ দেখিয়ে যাচ্ছে, দেখাচ্ছে নতুন ভাবে বাঁচার আশা, তিনি আমাদের মা জগজ্জননী চির আনন্দময়ী মা সারদাদেবী। ১২৬০ সাল ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, রাত্রি ১ দণ্ড ৯ পল, ইংরাজি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ, ২২ শে ডিসেম্বর,বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে মা সারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতৃভাবের বিশ্লেষণ করতে গেলে একথা বলতে হবেই যা মা নিজে বলেছেন, 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা,' অর্থাৎ যার কাছে সব সন্তানই সমান। যিনি ভালোরও মা, মন্দেরও মা। যেমন ছিল তাঁর মানুষের প্রতি ভালবাসা তেমনই ছিল জগতের সমস্ত প্রাণীদের প্রতি। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। যে ব্রহ্মচারী মায়ের সেবক ছিলেন, তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না,বরং মাঝে মাঝে বিড়ালটিকে প্রহারাদিই করতেন। মা তা জানতেন, কিন্তু মায়ের স্নেহে যত্নে বিড়ালটির বংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা যাওয়ার সময় ব্রহ্মচারীকে ডেকে মা বললেন, - 'বিড়ালগুলির জন্য চাল নেবে, যেন কারও বাড়ি না যায়। তারপর ভাবলেন শুধু এইটুকু বলাতে বিড়ালের ভাগ্য ফিরবে না, তাই মা আবার বললেন, দেখ বেড়ালগুলোকে মেরো না, ওদের মধ্যেও তো আমি আছি।'

এর থেকে বোঝা যায় মা কতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারিণী ছিলেন। মা আরও বলেছিলেন, 'আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে,' অর্থাৎ শরৎ হলেন স্বামী সারদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক আর আমজাদ হলেন একজন ডাকাত। মায়ের দৃষ্টিতে দুজনেই সমান, দুজনেই তাঁর সন্তান। তাঁর মাতৃভাব এতটাই প্রকট ছিল। একবার এক যুবক ভক্তের খুব দুর্নাম রটেছিল। কিছু ভক্ত মায়ের কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, মা যেন যুবকটিকে আর আসতে নিষেধ করেন। কিন্তু মা বললেন, ' মা হয়ে তাকে আসতে নিষেধ করব কি করে? অমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।' মা বলতেন, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকণা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।' আবার স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বিদেশী দ্রব্য বয়কট করতে হবে, এবং দেশীয় জিনিস ব্যবহার করতে হবে ঠিক এমন সময়ে মা আর এক ব্রহ্মচারীকে দুর্গাপূজার আগে মেয়েদের জন্য কাপড় কিনতে বাজারে পাঠালেন। ব্রহ্মচারীটি ছিলেন স্বদেশী ভাবাপন্ন। তাই মোটা স্বদেশী কাপড় কিনে ফিরলেন। কিন্তু মেয়েদের তা পছন্দ হল না, তাই ওই কাপড় ফেরত দিয়ে মিহি কাপড় আনতে বললেন। স্বভাবতই ব্রহ্মচারী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওসব তো বিলেতি হবে ও আবার কি আনব?' মা পাশে বসে সব শুনছিলেন, তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবা তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমায় সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়, আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা (মেয়েরা) যেমন যেমন বলছে - তেমনই ত্রাণ দাও।

মা তাঁর মেয়েদের জন্য বিলাতি বস্ত্র কিনে আনতে বলেছিলেন বলে তার মানে এই নয় যে তিনি বিলেতি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সব বড় জাতি মিলে ঠিক করলেন, যুদ্ধ আর হতে দেওয়া হবে না। সংঘর্ষের কারণ কিছু ঘটলে তা সবাই মিলে আপসে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তখন এক ভক্ত মায়ের কাছে সেই সুসংবাদ জানালে মা বলেছিলেন 'এ তো খুব ভালো কথা, কিন্তু ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ, যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।' অর্থাৎ মা বলেছেন যে কথাগুলি পৃথিবীর দেশ নেতাদের প্রাণের কথা নয় শুধু মুখের কথা ছিল মাত্র। মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কে বা বুঝতে পারে, মানুষের দৃষ্টি দিয়ে যদি তা বুঝতে যাওয়া হয় তা সর্বক্ষেত্রে ভুলই হবে।

সারদামায়ের আরও একটি মাতৃরূপের বর্ণনা দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে, সত্যি কথা বলতে, ঠাকুর যদি মায়ের সম্পর্কে কিছু না বলে যেতেন তাহলে মা জগতের কাছে হয়তো চিরকালের জন্য অবগুণ্ঠিতাই রয়ে যেতেন। তাঁর মহিমা ত্যাগ সব জগতের কাছে অজানাই থেকে যেত। ঠাকুর বলেছেন 'ঐ যে মন্দিরে মা (অর্থাৎ ভবতারিণী) রয়েছেন তার সঙ্গে এই নহবতের মা

(সারদাদেবী) অভেদ। অর্থাৎ মন্দিরে যে মা রয়েছেন তিনিই মানবী রূপে পৃথিবীতে এসেছেন মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে জগতকে রক্ষা করতে। ঠাকুর মায়ের সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন যে, মা হলেন - সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মা (সারদাদেবী) হলেন তাঁরই শক্তি, অর্থাৎ তিনি এক, মা একই। একথা মাও নিজে মুখে বহুবার বলেছেন, যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিও এক বাক্যে বলে গেছেন যে শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি, তাঁর সত্তার পরিপূরণের জন্য তিনি জগতে এসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে মা সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণের মূল ভাবকে যথাযথভাবে জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। আমরা যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করি, এই পূজাও সর্ব প্রথম মা-ই করেছিলেন। ঠিক যেন শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রথম করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শুধু তাই নয়, স্বামীজী যখন মা কে জানালেন তিনি বিদেশে যেতে চান - মা তখন তাঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেছিলেন। কারণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা তিনি, তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, স্বামীজীর ভিতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব জগতে প্রচারিত হবে।

আজ সারা বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তৃতি এই রামকৃষ্ণ সংঘের মাধ্যমে। আজও ঠাকুরের ভাব সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে এই রামকৃষ্ণ সংঘের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মা তা উপলব্ধি করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে মা বলেছেন, 'এর (মঠের) জন্য ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ টঠ যা কিছু, তার পর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে, কারণ মা জানতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে এসেছেন এক নতুন ভাব ও আদর্শ নিয়ে, সেই ভাব, সেই আদর্শ জগতে প্রচারের প্রয়োজন। কারণ তাতে জগতের কল্যাণ হবে। জগতে আসবে নতুন শান্তি। মানুষের মনে জাগবে অনুপ্রেরণা, নতুন করে বাঁচার আশা।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক জীবনের ভীষণ অশান্তি মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। বিশেষ ভাবে পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীশ্রী মায়ের বাণী আদর্শ জীবনের অভিব্যক্তি। দুঃখের আঁধার রাত্রি যাদের জীবনে অনন্ত বাস্তব, বঞ্চনার অভিঘাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন যাদের, তাঁরাই এই সত্যিকারের মায়ের কাছে পেতে পারে নিরাপদ ও নির্ভয় আশ্রয়। শুধু তার সমকালের মানুষই নয় চিরকালের মানুষ যাতে মায়ের সেই মাতৃত্বের ভাবের জীবন জাগানিয়া স্পর্শে বেঁচে উঠতে পারে, প্রাণ মন সমর্পণ করে শুনতে পারে মায়ের সেই ভালবাসা ও স্নেহের শাশ্বত আশ্বাস ঃ 'মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। 'তিনি আছেন বলেই সমাজের মানুষ আজও নতুন আশ্বাসে বেঁচে আছেন। যেমন বেঁচে ছিলেন সেদিন। মা ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। সন্ন্যাসী গৃহী সকল সন্তানের উপরই ছিল মায়ের সমান স্নেহ ভালোবাসা। গৃহস্থ সন্তানেরাও যেমন মায়ের কাছে এসেছেন; কখনও তাঁদের মনে হয়নি যে তাদের প্রতি মায়ের কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ হয়েছে বা স্নেহমমতার কিছু কমতি আছে। মায়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা তাদের সুখ দুঃখের সংসার যাত্রায় অন্তরের দুঃখবেদনা লাঘব করত ও আনন্দ উৎসাহ বৃদ্ধি করত। মা অনেকেরই বাড়িঘর-পরিবার-পরিজন, চাকরি-রোজগার, সাংসারিক অবস্থার খোঁজ নিতেন, এমনকি তারা কোনো সমস্যার কথা নিবেদন করলে মা তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং সঠিক কর্তব্য ও উপদেশ দিতেন। সন্তানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও ছিল মায়ের আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছেলেদের শুকনো মুখ, দীনবেশ, ক্ষীণ শরীর মা দেখতে পারতেন না। তাই সেখানে সকলের জন্য ছিল প্রতিদিনের মাছের ব্যবস্থা, কারণ বাঙালি ছেলেদের মাছ না হলে খাওয়াতে মন ভরে না, মা তা জানতেন। খাওয়ার পরে সকলেই পান খাবে, মা নিজেই পান সেজে রাখতেন। ছেলেরা যারা পান বেশি ভালবাসত তারা বেশি পেত। ছেলেরা মুখ ভরে পান চিবুচ্চে দেখলে মা খুব খুশি হতেন। জয়রামবাটীতে সমস্ত পুরুষ ভক্তকে খাইয়ে পরে স্ত্রী ভক্তদের নিয়ে মা নিশ্চিন্তে আহার করতে বসতেন। কোনো কাজের জন্য কোনো ছেলে বাইরে গেলে, সে না ফেরা পর্যন্ত যত বেলাই হোক, মা অপেক্ষা করতেন। রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতেন, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন - 'বাছা এত বেলা পর্যন্ত খায়নি, খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে।' মায়ের এই মাতৃরূপের মাধুর্য দেখে জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের ভেদ বিসম্বাদ ভুলে পৃথিবীর সকল দেশের নরনারী মাতৃদর্শনে ছুটে এসেছে, মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়েছে। 'মা' 'মা' শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলেছে।

'আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয় - সত্য জননী।'

# সতেরও মা, অসতেরও মা, সত্য জননী - মা সারদা

**সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

জীব জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারমূর্তি, ব্রহ্মের শক্তি, সত্য জননী জগজ্জনী মা সারদা, বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে শ্রীশ্রী সারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তানরূপে।

শ্যামাসুন্দরী দেবী গর্ভবতী থাকাকালীন শিহড়ে ঠাকুর দেখতে ও পালাগান শুনতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় জয়রামবাটীর পশ্চিম সীমানায় এসে তাঁর হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হয়, দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। তখন শৌচের কিছুই হল না। কিন্তু বোধ করেছিলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদর মধ্যে প্রবেশ করায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠেছিল, তারপর বসেই ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, লাল চেলীপরা পাঁচ ছ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে, তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে বলল, 'আমি তোমার ঘর এলাম মা।' তখন তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল, সেই মেয়েই শ্যামাসুন্দরী দেবীর উদরে প্রবেশ করে, তা থেকেই মা সারদার জন্ম।

সারদাদেবীর বাল্যজীবনের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় না। ছ'বৎসরে পদার্পণ করার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর বিবাহ হয়। তারপর ১২৭৪ সালে শ্রীশ্রী ঠাকুর কামারপুকুরে এসেছিলেন, তখন জয়রামবাটী হতে সারদা দেবীও কামারপুকুরে এসেছিলেন। তখন শ্রীশ্রীমায়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর। ঐ সময়ে চার পাঁচ মাস একত্র বাসের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে শ্রীমা লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অনেক শিক্ষাই পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসার পর সারদাদেবীও জয়রামবাটীতে চলে যান। তারপর ১২৭৮ সালের চৈত্র মাসে সারদাদেবী তাঁর পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ১২৮০ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে ঠাকুর, শ্রী সারদাদেবীকে ষোড়শী রূপে পূজা করেন, ফলহারিণী কালী পূজার দিন। এই পূজার মাধ্যমে তিনি শুধু যে সারদাদেবীকে প্রতিষ্ঠিতা করলেন দেবীত্বে, তাই নয়, বিশ্বের নারীকে দিলেন বৃহত্তম মর্যাদা, মহোত্তম গরিমা। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোঃ নমঃ' - করলেন এই মন্ত্রের সার্থক উচ্চারণ। দক্ষিণেশ্বরে ষোড়শী পূজার রাত্রেই শ্রী সারদাদেবীর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল।

তারপর ১২৯৩ সালের ৩১ শে শ্রাবণ শ্রী রামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ পনেরোটি বৎসরকে শ্রীমার সাধনকাল বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা তীব্র সাধনা - শ্রী ঠাকুরের সেবা।

ক্রমে শ্রী ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হল। তখন শ্যামপুকুরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতলবাড়ি ভাড়া করে ভক্তগণ অসুস্থ ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে নিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। সুচিকিৎসা চলতে লাগল, কিন্তু সুপথ্যের অভাবে চিকিৎসার আশানুরূপ ফল কিছুই দেখা গেল না। তখন ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমাকে নিয়ে এলেন, শ্যামপুকুরের বাড়িতে। সেখানে শ্রীমা অত্যন্ত কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি প্রস্তুত করতেন এবং যথাসময়ে লোকজন সরিয়ে দেওয়া হলে ঠাকুরকে পথ্যাদি খাইয়ে যেতেন।

তারপর কাশীপুরের বাগানবাটীতে শ্রীঠাকুর তাঁর জীবনের শেষ কটি মাস শ্রীমার হাতের সেবা গ্রহণ করে মহাসমাধি লাভ করলেন। শোকাকুলা শ্রীমা পরদিন ধারণ করলেন বিধবার বেশ। শ্রী অঙ্গ হতে খুলে ফেললেন একে একে সকল আভরণ। যখন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, তখন শ্রী ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বালা খুলতে দিলেন না। হাতের বালা খোলা হল না। শ্রীমা নিজের হাতে শাড়ির পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিলেন এবং সেই অবধি বরাবর তিনি সরু লালপেড়ে কাপড়ই পরতেন।

শ্রী ঠাকুরের দেহাবসানের পর শ্রীমাও শরীর ছেড়ে দেবার সংকল্প করেন। তখন ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, 'না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।' ঠাকুরের আদেশে থাকতেই হয়েছিল শ্রীমাকে।

তারপর শ্রীমা হরিদ্বার হতে জয়পুর হয়ে বৃন্দাবনে ফিরে কিছুদিন পরেই এলেন কলকাতায় এবং কয়েকদিন বলরামবাবুর বাড়িতে অতিবাহিত করে কামারপুকুরে যান। এ যাত্রায় শ্রীমা কামারপুকুরে আট-ন মাস বাস করেন। শ্রী ঠাকুর একসময় তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে, শাক ভাত খাবে, আর হরিনাম করবে।' আদর্শ সাত্ত্বিক জীবন যাপনের কী সুন্দর চিত্র!

এদিকে ত্যাগী ভক্তগণ শ্রীমার কামারপুকুরে থাকার অসুবিধার কথা জানতে পেরে, তাঁকে কলকাতায় আসবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখতে লাগলেন। শ্রীমা কলকাতায় এলেন। তাঁর গভীর গঙ্গাভক্তির জন্য ভক্তগণ গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে, ঠিক গঙ্গার উপরে, বর্তমান বেলুড় মঠের নিকটবর্তী নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িটি ভাড়া নিয়ে শ্রীমাকে রাখলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রীভক্ত ছিল এবং দেখাশুনা করার জন্য ছিলেন স্বামী যোগানন্দ।

বেলুড়ে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দে কাটাবার পর শ্রীমা পুরীতে গেলেন জগন্নাথের দর্শনে। শ্রীমা প্রায় তিন মাস পুরীতে বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর' বাড়ীতে বাস করে, জগন্নাথ দর্শন করে,পুরী হতে শ্রীমা কলিকাতায় এসে প্রায় তিন সপ্তাহ পরেই প্রেমানন্দ, মাস্টার মশাই প্রভৃতিকে সঙ্গে করে আঁটপুরে যান। সেখানে কয়েকদিন থেকে তিনি কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। এ যাত্রায়ও শ্রীমা প্রায় এক বৎসর সেখানে বাস করে পরে এলেন কলকাতায়।

স্বীয় জননীর স্বর্গারোহণের পরে ঠাকুর শ্রীমাকে গয়ায় গিয়ে ঁবিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে বলেছিলেন। শ্রীঠাকুরের ঐ আদেশ স্মরণ করে, শ্রীমা, স্বামী অদ্বৈতানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গয়াধামে গিয়ে ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে গয়াকৃত্যাদি সমাপন করেন। বিষ্ণুগয়া হতে শ্রীমা বোধগয়া দর্শনেও গিয়েছিলেন। তারপর গয়া থেকে ফিরে এসে শ্রীমা কলকাতায় কিছুদিন মাস্টারমশাই এর বাড়ি ও বলরামবাবুর বাড়িতে থাকেন এবং পরে বেলুড় গ্রামে ঘুষুড়ী শ্মশানের নিকট এক ভাড়াটে বাড়িতে প্রায় চার মাস ছিলেন। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার অজস্র আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে দীর্ঘদিনের জন্য পরিব্রাজকরূপে বহির্গত হয়েছিলেন।

ঘুষুড়ীর বাড়িতে শেষের দিকে শ্রীমা কঠিন রক্তআমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। সেজন্য তাঁকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়িতে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হল। বরাহনগর হতে তিনি কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী যান।

ঐ সময় শ্রীমা জয়রামবাটীতে অনেকদিন ছিলেন এবং পরে ১৩০০ (১৮৯৩) সালের আষাঢ় মাস নাগাদ তিনি পুনরায় কলকাতায় এলেন। এবারও ভক্তগণ তাঁকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটে বাড়িতে রেখেছিলেন। ওই সময়ে তিনি পঞ্চতপা করেন। চার পাঁচ মাস বেলুড়ে কঠোর তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করার পরে শ্রীমা কয়েক মাসের জন্য জয়রামবাটী গমন করেন, কিন্তু জনৈক বিশিষ্ট ভক্তের আন্তরিক অনুরোধে শ্রীমাকে পুনরায় কলকাতায় এসে, তাঁদের সঙ্গে কৈলোয়ার (বিহারের শাহাবাদ জেলায়) গিয়ে দুমাস থাকতে হয়েছিল। কৈলোয়ার থেকে ফিরে এসে শ্রীমা পুনরায় কয়েক মাস বেলুড়ে ছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের ভক্তিমতী মাতা তাঁদের বাড়ি আঁটপুরের ঁদশভুজার প্রতিমায় আরাধনার আয়োজন করেছেন। তাঁদের বিশেষ আগ্রহে শ্রীমাকেও ঁপূজা উপলক্ষে যেতে হল আঁটপুরে। ঐ ঘটনার উল্লেখ করেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে জনৈক গুরুভ্রাতাকে লেখেন, 'বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজা করতে বসেছে। পূজার পরে শ্রীমা আঁটপুর থেকে জয়রামবাটী আসেন।

এই সময়ে শ্রীমার প্রাণে তাঁর বৃদ্ধা গর্ভধারিণীকে তীর্থ দর্শনে নিয়ে যাবার ইচ্ছা বলবতী হল। তিনি গর্ভধারিণী ও নিকট আত্মীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে কলকাতা হয়ে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করতে যান, এবং প্রায় তিন মাস তীর্থবাস করে কলকাতায় ফিরে এলেন। শ্রীমা তাঁর গর্ভধারিণী প্রভৃতিকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মাস্টারমশয়ের কলুটোলার বাড়িতে মাসখানেক রইলেন। পরে তাঁর মা ও ভাইদের আহ্বানে তাঁকে শীঘ্রই জয়রামবাটীতে যেতে হল। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পুনরায় ফিরে এলেন কলকাতায়। ভক্তগণ তখন তাঁকে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে গুদামওয়ালা বাড়িতে পাঁচ ছয় মাস রেখেছিলেন।

পুনরায় জয়রামবাটীতে গিয়ে শ্রীমা প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। এবার যখন তিনি কলকাতায় এলেন (১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসে) তখন তাঁকে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে রাখা হয়েছিল। ততদিনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ক্রমে বেলুড়ে স্থায়ী মঠ নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করলেন। মঠ নির্মাণ কার্য দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ১৩০৫ সনের কালীপূজার দিনে স্বামীজী সঙ্ঘ জননীকে বাগবাজার থেকে নিয়ে এলেন মঠ প্রাঙ্গণে। শ্রীমা সেখানে এসে তাঁর নিত্য পূজিত শ্রীঠাকুরের ছবি পূজা করলেন। মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিষ্ঠিত হলেন। বেলুড় মঠ মহাতীর্থে পরিণত হল।

তারপর ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) পুণ্য মুহূর্তে স্বামীজী বেলুড়ের ভাড়াটে মঠবাড়ি থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থির কৌটোটি (যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'আত্মারামের কৌটা') নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন স্থায়ী মঠে এবং তাঁকে ঐখানে স্থাপনা করলেন। পরবর্তী ২রা জানুয়ারি (১৮৯৯) মঠ স্থায়ীভাবে উঠে এলে নতুন মঠবাড়িতে।

১৩০৮ সনে স্বামীজী খুব ঘটা করে বেলুড় মঠে প্রতিমার দুর্গাপূজা করলেন। 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীসারদাদেবীকে এনে রাখলেন মঠের পাশ্ববর্তী নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িতে। যথাসময়ে স্বামীজি শ্রীসারদাদেবীকে মঠে নিয়ে এসে তাঁকে 'জ্যান্ত দুর্গা' রূপে পূজা করলেন। বহু লোক সেদিন শ্রীমাকে দর্শন করে ধন্য হয়েছিল।

পরবর্তীতে শ্রীমা জয়রামবাটীতে অবস্থান করেছিলেন। তখন জয়রামবাটীতে ভক্ত সমাগম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যাত্রীদের 'জয় মা' ধ্বনিতে ঘোষিত হচ্ছে জয়রামবাটীর মহাতীর্থের মহিমা। কিন্তু, বেঘোর স্থান জয়রামবাটী। আসা যাওয়ার বহু কষ্টসাধ্য, ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক লোক আসতে পারত না জয়রামবাটীতে। সেজন্য শ্রীমাকে নানা অসুবিধা বরণ করেও অনেক সময় কলকাতায় থাকতে হত। ১৮৯৮ সাল হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত শ্রীমা মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতেন, তখন বাগবাজার অঞ্চলে বিভিন্ন ভাড়াটিয়া বাড়িতে, কখনও বা ভক্তগৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীমায়ের কলকাতা বাসের এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য স্বামী সারদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বাগবাজারে 'মায়ের' জন্য একটি বাড়ি নির্মিত হল (বর্তমান 'শ্রী মায়ের বাড়ী')। ১৯০৯ সালের ২৩ শে মে (১৩১৬, ৯ই জৈষ্ঠ্য) শ্রীমা বাগবাজারের নতুন বাড়িতে এলেন এবং নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীঠাকুরকে। এ বাড়িতেই এসে তিনি খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন।

১৩১৭ সনের ১৯ শে অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর ১৯১০) শ্রীমা কোঠারে গিয়েছিলেন ৺বলরামবাবুর স্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে। কোঠারে অবস্থানকালে শ্রীমার মনে বহু দিনের ৺রামেশ্বর দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হল। শ্রীমার অভিপ্রায় জানতে পেরে মাদ্রাজ হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁর দক্ষিণদেশে ভ্রমণের সকল প্রকার দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। তদনুসারে ১৩১৭, মাঘ মাসে শ্রীমা সেবক ও সঙ্গীনীদের নিয়ে কোঠার হতে দক্ষিণ ভারতের প্রধান ৺রামেশ্বর দর্শনের জন্য যাত্রা করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীমাকে ৺রামেশ্বরম মন্দিরে নিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে শ্রীমা ১০৮ টি সোনার বেলপাতা দিয়ে ৺রামেশ্বর শিবের পূজা করেন। ৺রামেশ্বর দর্শন করে শ্রীমা বলেছিলেন, যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।' শ্রীমায়ের এই উক্তির অর্থ হলো - ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে লঙ্কা থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধার করে অযোধ্যা ফেরার সময় শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী ৺রামেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন। মা সারদার ৺রামেশ্বর দর্শনের সময় তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। তখন শ্রীমা স্মরণ করেন যে, তিনি পূর্বজন্মে সীতা দেবী ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তাই শ্রীমা উপরিউক্ত উক্তিটি করেছিলেন।

তারপর, শ্রীমা ৺রামেশ্বর হতে ফিরে এসে কিছুকাল বাগবাজারে ছিলেন। এইভাবেই বাগবাজার হতে জয়রামবাটী ও জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসা যাওয়াতেই শ্রীমার সময় কেটে যায়। দিনও বয়ে চলে। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে শ্রীমার শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

১৩২৬ সালের ২৭ শে অগ্রহায়ণ জয়রামবাটীতে শ্রীমার জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে তাঁর সামান্য জ্বর হয়েছিল। মাঝে মাঝে একটু ভালো থাকেন - আবার জ্বর হয়। এইভাবে ভুগে ভুগে তাঁর শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ল। শ্রীমা ভুগছেন, এই সংবাদ পেয়ে স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করলেন। ১৫ই ফাল্গুন (১৩২৬) শ্রীমা কলকাতায় পৌঁছলেন। সেখানেই শ্রীমার চিকিৎসা চলছিল।

শ্রীমার স্বধামে প্রস্থানের ছ'সাতদিন মাত্র বাকি। মুখটি শুকনো করে রাধু শ্রীমায়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমা কতকটা

তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'দেখ তুই জয়রামবাটী চলে যা। আর এখানে থাকিস নে।' নিকটস্থ সেবিকাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'শরৎকে বলো, ওদের জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিতে।

সেবক সেবিকাগণ শরৎ মহারাজের নির্দেশে শ্রীমার মন যাতে রাধুর উপর আসে, তার জন্য করছিলেন নানা চেষ্টা। কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হল না। শ্রীমা বেশ দীপ্তকণ্ঠে একদিন শুনিয়ে দিলেন, 'যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না, জন্মে।'

দেহত্যাগের সাতদিন পূর্বে শরৎ মহারাজকে নিকটে ডাকিয়ে শ্রীমা বললেন, 'শরৎ এরা রইল।'

অবশেষে শ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর চৌত্রিশ বৎসরের স্থূল বিচ্ছেদের অবসান হল। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ (১৯২০, জুলাই), রাত্রি দেড়টায় শিবযোগে, ৬৬ বছর ৭ মাস বয়সে, শ্রীমা পরমশিব শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে চিরমিলিতা হলেন।

পরদিন (২১শে জুলাই, ১৯২০) প্রাত সাড়ে দশটার সময় স্বামী সারদানন্দজীর পরিচালনার অগণিত সাধু ভক্তগণ পুষ্প মাল্যাদি সুসজ্জিত পালঙ্কে শ্রীমায়ের পূত দেহ বহন করে 'রামনাম' কীর্তন করতে করতে বাগবাজার মায়ের বাড়ি হতে বরাহনগরের পথে বেলুড়মঠ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অনন্তর অপরাহ্ন তিনটায় স্বামীজীর মন্দিরের উত্তরদিকে চন্দন কাষ্ঠ সজ্জিত চিতায় শ্রীমায়ের পূতদেহ আহুতি দেওয়া হল। বেলুড় মঠে পবিত্র চিতা স্থানের উপর গঙ্গামুখ করে মাতৃ মন্দির নির্মিত হল এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর, বুধবার শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথির দিনে এই মন্দির যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ বিদেশের অগণিত নরনারীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে।

# ওড়িশার জগন্নাথ কেন্দ্রিক বিতর্ক ও জগন্নাথ সংস্কৃতির আলোকে একটি পর্যালোচনা

**রাহুল রায়**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

প্রাচীন উৎকল বা বর্তমান ওড়িশার ইতিহাসে জগন্নাথক্ষেত্র অর্থাৎ পুরী একটি প্রধান স্থান হিসাবে পরিচিতি পেয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আদি, মধ্য বা মধ্য যুগের ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধ্যায়ে ওড়িশা ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ওড়িশার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ইতিহাসে জগন্নাথক্ষেত্র সম্পৃক্ত। জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জগন্নাথ সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতির উৎপত্তি, বিস্তার, বিবর্তন এবং জগন্নাথ সংস্কৃতির সমন্বয়ী ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানাবিধ যুক্তি রয়েছে এবং বিষয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। আমার এই প্রবন্ধে আমি মূলত জগন্নাথদেবের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিতর্কগুলি এবং ওড়িশার জগন্নাথ সংস্কৃতি কীভাবে একটি সমন্বয়ী ও মিশ্র সংস্কৃতির রূপ নিলো, সে বিষয়ে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছি।

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি নিয়ে বৌদ্ধ গবেষকদের বিস্তৃত গবেষণা রয়েছে। এজাতীয় গবেষকরা মনে করেন, শ্রীজগন্নাথ হল ভগবান বুদ্ধেরই রূপান্তর। ডঃ কাকনন্দ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত শ্রীলঙ্কার প্রখ্যাত তামিল পণ্ডিত ডঃ কাকনন্দের বক্তব্য অনুযায়ী, পুরীর জগন্নাথ ও ভগবান তথাগতর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক গবেষকদের গবেষণায় জগন্নাথ মন্দির এবং মূর্তিতে যে বৌদ্ধধর্মমূলক বিষয়ের অনুপ্রবেশ রয়েছে, তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রাচীনকালে বর্তমান জগন্নাথ মন্দির একটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতে আসা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের লেখা গ্রন্থ থেকে। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী সুপ্রাচীন উৎকলের পূঃ-দঃ প্রান্তে সাগরতটে চরিত্রপুত্র নামে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল, বর্তমান পুরীই হল সেই চরিত্রপুর। এই চরিত্রপুরে হিউয়েন সাং ৫টি বৌদ্ধস্তূপ দেখেছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহামের মতে ওই ৫টি বৌদ্ধস্তূপের ১টি জগন্নাথ মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে আগত ফাহিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও বর্তমান পুরীধামে তৎকালীন সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ছিল এবং ব্রাহ্মণদের কোন আধিপত্য ছিলনা, এ বিবরণ রয়েছে।

ডঃ কাকনন্দের বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমান পুরীতে জাতিভেদ প্রথা মানা হয় না, এটিও একটি বৌদ্ধপ্রথা। এছাড়াও জগন্নাথের বক্ষের মধ্যে বিষ্ণুর যে পঞ্জরাস্থি রক্ষিত আছে, সেটিও একটি বৌদ্ধপ্রথা। হিন্দুদের কাছে মৃতের অস্থি অপবিত্র। কিন্তু বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধদেবের অস্থি, দন্ত, নখ, কেশ, এগুলি সবই পবিত্র এবং বৌদ্ধরা এগুলিকে পূজা করে। পুরীর মন্দিরের দশাবতার চিত্রপটে বুদ্ধাবতারের জায়গায় জগন্নাথের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। জেনারেল কানিংহাম প্রমাণ করেন, জগন্নাথ, শুভদ্রা ও বলরাম এই তিন মূর্তিই হল বৌদ্ধ পূজিত বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। বৌদ্ধরা সাধারণত ধর্মকে স্ত্রী রূপে বর্ণনা করে থাকেন এবং পরবর্তীকালে হিন্দুরা বৌদ্ধদের ধর্মকে সুভদ্রার রূপ প্রদান করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কানিংহাম দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে সাঁচি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থল থেকে এবং শকরাজাদের মুদ্রা থেকে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের অনেকগুলি প্রতীক সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলির সাথে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের মূর্তির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডঃ কাকনন্দের বক্তব্যের মধ্যে, একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় যে, বর্তমান সময়ে হিন্দু পূজিত দেবতা জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরাম প্রাচীনকালে বৌদ্ধ পূজিত বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘেরই রূপান্তরিত রূপ।

এছাড়াও বৌদ্ধপ্রভাবের সপক্ষে ডঃ কাকনন্দ আরও বিস্তারিত প্রমাণ তুলে ধরেছেন। সেগুলির অবতারণা করলে কতকগুলি বিষয় উত্থিত হয় এক্ষেত্রে। প্রথমত, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর এমন অদ্ভুত দর্শন মূর্তি কেবলমাত্র পুরীধাম ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, জগন্নাথ মূর্তির সাথে অন্য কোনো দেবতা, মানুষ বা পশুর চেহারার মিল নেই। তৃতীয়ত, ঔরঙ্গাবাদের মধ্যে ইলোরার কাছে একটি বৌদ্ধ দেবালয় রয়েছে, যা জগন্নাথের মন্দির নামে খ্যাত। চতুর্থত, কাশী বা মথুরার পঞ্জিকাতে বুদ্ধাবতারের জায়গায় জগন্নাথের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ হান্টার, ফার্গুসন, কানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল এবং অক্ষয় দত্তের মতন বিশেষজ্ঞরা বৌদ্ধপ্রভাবের সপক্ষেই বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়াও ওড়িশার প্রাচীন গ্রন্থকার শিশুরাম, মুকুন্দরাম, মাণ্ডনিয়া দাস অথবা বেঙ্কটাচার্য বৌদ্ধপ্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি কবি জয়দেব ভগবান বুদ্ধের একজন ভক্ততে পরিণত হয়েছিলেন এবং তিনি 'দশাবতার স্তোত্রম' নামক বুদ্ধের জয়গাথা রচনা করেন। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মতে, পুরীর বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং সে সময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে পরবর্তী হিন্দুরাজারা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে পুরীর মন্দিরের বৌদ্ধত্বের সমস্ত প্রমাণ ও তথ্য মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল।

বৌদ্ধপ্রভাবের বিরুদ্ধে অন্য একটি ব্যাখ্যা বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। এ জাতীয় গবেষকদের বক্তব্য অনুযায়ী পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে কোনোভাবেই বৌদ্ধস্থল হিসেবে গণ্য করা যায় না এবং এখানে বৌদ্ধপ্রভাব নেই। এ জাতীয় গবেষকরা ডঃ কাকনন্দের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা কিন্নরীর কথা বলতে পারি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী হিউয়েন সাং চরিত্রপুর বা পুরীতে গিয়ে যে বৌদ্ধস্তূপগুলি দেখেছেন বলে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলি ছিল তাঁর ভ্রম। চীনা ভাষাবিদ ডঃ বেল তাঁর গ্রন্থ 'সি-যু-কি' তে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন হিউয়েন সাং যখন পুরীতে যান তখন ওখানে রাজা গালের ৫টি সুউচ্চ মন্দির প্রাসাদ ছিল। তিনি ওগুলোকেই ভ্রমবশত বৌদ্ধস্তূপ ভেবেছিলেন। স্কন্দপুরাণের 'উৎকল খণ্ড'তে এই রাজা গালের পরিচয় রয়েছে। উৎকল খণ্ডে বলা হয় যে, বুদ্ধের জন্মের শত শত বৎসর পূর্বে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে যে মন্দিরে নীলমাধবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর অবর্তমানে সমুদ্রের বালুরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজা গাল এই মন্দিরের পুনরুদ্ধার করেন এবং এই মন্দিরের কিছুটা দুরেই ৫টি অভ্রলেহী প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করেন। যদিও আধুনিক গবেষকদের অনেকেই এই ঘটনাবলিকে শুধুমাত্র একটি কিংবদন্তি গল্প হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

তবে 'মৈত্রী উপনিষদ'-এ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম পাওয়া যায়। উৎকলে অর্থাৎ প্রাচীন ওড়িশাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার বহু পূর্ব থেকেই জগন্নাথ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল এবং সেখানে মাধবের প্রস্তরময় মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত ছিল। যা পরবর্তীকালে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের জগন্নাথে উন্নীত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে উৎকলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী সময়কাল থেকে বৌদ্ধপ্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, গুপ্তযুগ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবশালী যুগ ছিল। অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তীকালে বৌদ্ধপ্রভাবে জগন্নাথ মন্দিরের পূজার্চ্চনা বৌদ্ধমতে হতে শুরু হয়। কিন্তু তা কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিনষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণরা আবার তাঁদের হৃত ক্ষমতা ফিরে পায়। আধুনিক ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম আকর গ্রন্থ 'মাদলা-পঞ্জিকা'তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন থেকে শুরু করে যে যে রাজা ক্ষমতায় আসেন, তাঁদের অধীনে এই মন্দির ছিল। এখানে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধমতে জগন্নাথদেবের পূজার্চ্চনা হত। ১৯২৯ খ্রিঃ প্রকাশিত 'Puri Gatteers' এ প্রখ্যাত পুরাবিদ L.S.S.O'Malley বৌদ্ধপ্রভাবের যুক্তিকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৫তম সুক্তের তৃতীয় ঋক হল, 'অদোযদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃপারে অপুরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্।' এই ঋকটির ভাষ্যে খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য লিখেছেন, 'দূরবর্তী স্থানে বর্তমান স্বয়ম্ভু বা অপৌরুষেয় যে দারুময় পুরুষোত্তম নামক ভাগবদ্ বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান, সেই দারুব্রহ্মকে আশ্রয় করো এবং তাঁর উপাসনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবলোকে গমন করো। উৎকল খণ্ডের, সাতশো বছরের পুরানো তালপাতার পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, যেখানে এই ঋকটির অনুকূলে লেখা হয়েছে, - 'য এব প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমুপাস্য দুরারাধাং মুক্তিং যাস্তিং সুদুর্লভাম্।' এগুলির মাধ্যমে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদে ব্রহ্মের মহিমা প্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং বর্তমানের জগন্নাথ যে বুদ্ধেরই পরিবর্তিত রূপ, এ জাতীয় ভাবনা গ্রহণযোগ্য নয়।

গবেষকদের একাংশের মতে, পুরীর জগন্নাথ মন্দির একসময় প্রবলভাবে বৌদ্ধপ্রভাবে ছিল এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের

বহুপূর্ব থেকে এই ক্ষেত্রটি হিন্দু তীর্থ হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে এখানে বৌদ্ধরা হিন্দুদের বিতাড়ন করে নিজেদের মতন করে জগন্নাথের পূজার্চ্চনা শুরু করে। এর প্রমাণ 'মাদলা পঞ্জী'তে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিষ্ণুর পঞ্জরাস্থির কথা কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে নেই, তা বৌদ্ধদের দ্বারাই প্রচারিত। 'নবকলেবর' প্রথাটিও প্রাচীন নয়, এটি পরবর্তীকালে সংযুক্ত হয়েছে। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা 'সুতসংহিতা' ও 'নীলাদ্রি মহোদয়' এর কোথাও নবকলেবর উৎসবের কথা লেখা নেই। এমনকি আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের সামান্য আগে বা পরে রচিত স্কন্দপুরাণীয় 'পুরীমাহাত্ম্য'-এ পুরীর বড় দেউলের সমস্ত উৎসবের উল্লেখ থাকলেও নবকলেবরের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র তিনটি আধুনিক কবির রচনা ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে জগন্নাথকে বুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়নি। এগুলি হল ওড়িয়া ভাষায় লেখা মাণ্ডনিয়া দাসের 'ক্ষেত্রপুরাণ', শিশুরাম দাসের 'দারুব্রহ্ম' এবং তেলেগু ভাষায় রচিত বেঙ্কটাচার্য্যের 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' এই তিনজনই ছিলেন জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের বহু পরেরকার কবি। প্রাচীন 'ব্রহ্মপুরাণ' ও নারদপুরাণে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী আছে, কিন্তু সেখানে জগন্নাথকে কোথাও বুদ্ধ বলা হয়নি।

আধুনিক গবেষকদের বহুজনের মতে, জগন্নাথ ক্ষেত্রের উল্লেখ আমরা পাই বৈদিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন প্রাচীন পুরাণগুলিতে। এগুলির তথ্যসূত্র অনুযায়ী প্রাচীনকালে পুরীতে কেবলমাত্র একটিই মূর্তি ছিল। তথ্যসূত্র অনুযায়ী শবর সর্দার বিশ্ববসু যে মূর্তিটির পুজো করতেন, তাকে বিভিন্ন গ্রন্থে নীলমাধব বলা হয়েছে এবং সেই মূর্তি ছিল সংখ্যায় একটি। এই নীলমাধবই পরবর্তীকালে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বারা পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, কপিলসংহিতা ও উৎকলখণ্ডে জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্তির কথা বলা হয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী 'কপিলসংহিতা' রচনা হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরে এবং এখানে জগন্নাথ-বলরামের চতুর্ভুজ এবং সুভদ্রার দুই বাহুর বর্ণনা পাওয়া যায়। এর দরুন বলা যায় যে, বর্তমানকাল থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি ছিল, বর্তমানে ভুবনেশ্বরে প্রাচীন অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে অবস্থিত প্রস্তরময়ী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তির মতন। ওই মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম চতুর্ভুজ এবং সুভদ্রা দ্বিভুজা। 'বিষ্ণুরহস্য গ্রন্থের' অন্তর্গত পুরষোত্তম মাহাত্ম্যেও জগন্নাথের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু জগন্নাথের পূর্বের রূপ কেন হঠাৎ বিলীন হয়ে গেল? বর্তমান রূপ কোথা থেকে এলো? বলরাম ও সুভদ্রা কীভাবে রত্নবেদীতে আসীন হলেন? এজাতীয় বিষয়গুলি নিয়েও বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমান সময়কালে গবেষণা আরও বৃহৎ পর্যায়ে চলেছে।

গবেষকদের মতে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আদিবাসীরা দৈবশক্তি হিসাবে গাছ বা পাথরকে পুজো করতো। গাছের আর এক নাম হল 'দারু'। অপরদিকে ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী বর্তমানে যে দেবমূর্তি জগন্নাথরূপে পূজিত হয়, তা একসময় শবর গোষ্ঠীর আরাধ্য দারু দেবতা ছিল। এই দেবতাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে পূজিত হয়েছে দারুব্রহ্ম, নীলমাধব, পুরষোত্তম এবং জগন্নাথ প্রভৃতি রূপে। প্রাচীনতম পুরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা এবং সেখানে একটিই দেবমূর্তি পূজিত হত। অতঃপর খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে উৎকলের রাজনীতিতে রাজা জনমেজয়ের পুত্র যযাতিকেশরীর আগমন ঘটে। প্রাচীন উৎকল ইতিহাস অনুযায়ী, এই যযাতিকেশরীই ভগ্নপ্রাপ্ত পুরীর মন্দিরের নবনির্মাণ করান এবং এখানে নতুন মূর্তির স্থাপনা করেন। সেইসাথে তিনিই বৌদ্ধদের এখান থেকে বিতাড়ন করেছিলেন। এক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার 'মাইহারের শিলালিপি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতত্ত্ববিদ দীনেশচন্দ্র সরকার এবং ভি.এস. সুব্রহ্মন্যম এই শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করেন। এখানে দামোদর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রের নীলাচল ভ্রমণের কথা বর্ণিত রয়েছে। এই শিলালিপিটি দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হয়েছিল এবং এখানে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী এটা বলা যায় যে, দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু পূর্বেও উৎকলের সমুদ্রতীরে জগন্নাথ ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ছিল। এই লিপির বিশ্লেষণ করে আর একজন বিখ্যাত গবেষক জি.সি.ত্রিপাঠী বলেন, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগেও পুরীর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হিন্দুদের হাতেই ছিল, বৌদ্ধদের অধীনে নয়। তবে জগন্নাথক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীর ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আজও বিদ্যমান। এবিষয়ে আরোও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন।

আদিবাসী পূজিত দারুদেবতা থেকে জগন্নাথে রূপান্তরিত হবার পদ্ধতির ব্যাপারে গবেষকরা বিস্তৃত যুক্তি দিয়েছেন। ওড়িশার উপকূলবর্তী অঞ্চলে যখন শৈব ধর্মের প্রতিপত্তি ছিল তখনই এই বিবর্তন গতি লাভ করে এবং নরসিংহ কাল্টের সংমিশ্রণে এই পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। উল্লেখ্য নরসিংহ কেবল শৈব স্বীকৃত দেবতা নন, তিনি বৈষ্ণবদেরও আরাধ্য

এবং নরসিংহের সাথে ভৈরবও সম্পর্কযুক্ত। উৎকল এবং দঃ কোশলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই শবরদের আধিপত্য ছিল। পরবর্তীকালে আর্যরা যখন উৎকলে প্রবেশ করে তখন অনার্য আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচিতি ঘটে। আদিবাসী শবরদের সাথে বৈদিক, শৈব ও সবশেষে হয়তো বৈষ্ণব সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। সেই সাথে প্রাচীন উৎকলে বৌদ্ধদের প্রভাবের সময় তা বৌদ্ধসংস্কৃতি দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়। আনুমানিক পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে জগন্নাথ নামের পরিচিতি আরও বৃহৎ পর্যায়ে ঘটেছিল। জগৎগুরু শংকরাচার্যের আগমন, রামানুজের পুরী গমনে এখানে বৈষ্ণব প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। তবে জগন্নাথ উপাসনার ধারাটিকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে পুরীর বৈষ্ণবীয় ভাবধারা সর্বাধিক ত্বরান্বিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়কাল থেকে পুরীতে জগন্নাথ সংস্কৃতির প্রাচীন ধারাগুলির বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে এবং মিশ্র সংস্কৃতির দ্বারা বর্তমান প্রথাসমূহ এ রূপ বাস্তবতা পায়। অতঃপর সালবেগ, কবীর প্রমুখ সমন্বয়পন্থী সাধক জগন্নাথকে ইসলাম বর্ণিত আল্লাহর প্রতিভূ বলে মান্যতা দেন, যা জগন্নাথ চর্চায় এক নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। তবে সর্বশেষ গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এটা বলা যায় যে, প্রাচীন অনার্য সংস্কৃতির ধারা, আর্য সংস্কৃতি, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সকল সংস্কৃতিরই প্রভাবই জগন্নাথ সংস্কৃতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জগন্নাথ হল সমন্বয়ের প্রতীক, যাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন উৎকলের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছিল, তেমনই বর্তমান ওড়িশার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও জগন্নাথ সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা

১। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে, ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ প্রকাশনী, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৯।

২। জগন্নাথ কাহিনী, দুলেন্দ্র ভৌমিক, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩। History of the Jagannath Temple, A.N. Dwivedi, 1958, B.R. Publishing Corporation.

৪। KINGS WITHOUT A KINGDOM : THE RAJAS OF KHURDA AND THE JAGANNATH CULT, Hermann Kulke, 1974, Journal of South Asian Studies, Vol-4, Pages 60-77

# স্বামীজী ও নেতাজী

**সুদীপ্ত দে**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

১

প্রথম ঘটনা ঃ

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণরত মাত্র আঠারো বছরের একটি তরুণ, শিশুকাল থেকে ধর্মানুরাগ যাঁর সহজাত, যিনি কান্ট, হিউম, হেগেল, স্পেনসার পড়েছেন, আদ্যন্ত যুক্তিবাদী, তাঁকে এই প্রশ্ন পেয়ে বসেছিল - জীবন ও বিশ্বের পশ্চাতে আদতে কী বা কে? যা তাঁর আহার, নিদ্রা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। খুঁজছিলেন এমন একজনকে যিনি সেই সত্যানুসন্ধান দেবেন। গিয়েছেন একাধিক ধর্মযাজকের কাছে, পড়ে রয়েছেন ব্রাহ্মসমাজের দরজায়। প্রশ্ন একটাই - ''

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ

একটি পনেরো বছরের কিশোর, ছাত্রাবস্থায় এমন একটি আদর্শ খুঁজছেন, যার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর সমস্ত জীবনটা গড়ে তুলতে পারবেন। সবরকম প্রলোভন সেই আদর্শের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে।

দুটি ঘটনা, ব্যবধান প্রায় তিন দশক। দুজনেই খুঁজছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই খুঁজছেন -খুঁজছেন সেই সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বকে, যাঁকে পেলে বা যেটি পেলে জীবনে আর কিছুই চাওয়া - পাওয়ার থাকে না। শেষাবধি তাঁরা পেলেন, দুজনেই পেলেন, প্রথম জন পেলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট্ট ঘরটিতে, সিংহসম বীরের যুক্তিবাদিতা লুটিয়ে পড়লো তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ পূজারির পায়। যিনি লুটিয়ে পড়লেন তিনি বিশ্ব বন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ এবং যাঁর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন অর্থাৎ যাঁকে গুরুপদে বরণ করলেন তিনি অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। আর দ্বিতীয়জন, সেই কিশোরটি তিনিও পেলেন, হঠাৎই পেলেন, অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলেন - পেলেন তাঁদেরই এক প্রতিবেশী আত্মীয় সুহৃদচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বই এর গাদায়। নজরে পড়লো স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি। কয়েক পাতা উল্টেই তিনি বুঝলেন, এই সেই জিনিস যা তিনি এতদিন ধরে খুঁজছেন। 'বিবেকদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হলেন সেদিনের সেই কিশোর বালকটি, পরবর্তীতে বিশ্ববাসী যাঁকে চিনবেন বিশ্বেনেতা 'নেতাজী হিসেবে। এ যেন এক অনবদ্য গুরু পরম্পরা।

২

সুভাষচন্দ্রের জন্মগ্রহণের প্রেক্ষাপটটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যীশুখ্রিষ্টের আহ্বানে যেমন মৃত ল্যাজারাস জেগে উঠেছিল, সেভাবেই ভারতবর্ষ জেগে উঠেছিল স্বামীজীর আহ্বানে - 'Oh, my India! Arise'। ১৮৯৭, ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে মন্দ্রিত ছিল স্বামীজীর ভারত জাগরণের মন্ত্রগুলি। দেশব্যাপী যখন উদ্দীপনের এই আবহ তখনই জন্ম সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবী 'কথামৃত' পড়তেন অনেকদিন থেকেই এবং শোনা যায় বাল্যাবস্থায় সুভাষ মা'কে কথামৃত পড়ে শোনাতেন। যদিও বালক সুভাষের মতে তা ততটা প্রভাব বিস্তার করেনি, কিন্তু নিয়মিত যিনি কথামৃত পাঠ করতেন সেই মাতা, তিনি কি জানতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তি কাহিনী? নিশ্চয়ই জানতেন। এ প্রসঙ্গে ড. শঙ্করী প্রসাদ বসু বলেছেন -

'শোনা যায় মাতৃজঠরে থাকা কালে সন্তানের মধ্যে মাতার শুভবাসনা, শুভচিন্তা সংক্রামিত হয়। ১৮৯৭ সালের গোড়ায় ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের চেতনা ইথার তরঙ্গে ভাসমান ছিল। কোনো এক ঐতিহাসিক অলৌকিকতায় তা প্রবেশ করে গিয়েছিল প্রভাবতী দেবীর মধ্যে। কেননা দেখা যাবে ললাটে ওই চৈতন্যরেখা নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তাঁর ষষ্ঠ পুত্র সুভাষচন্দ্র।''

একথা বলায় বাহুল্য, এমন ভাগ্যবান সন্তানের আদর্শ পুরুষ যে স্বামীজীই হবেন তা যেন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল

মাতৃগর্ভেই। তবে তা খুঁজে পেতে সময় লেগেছিল বেশ কয়েক বছর। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস জিজ্ঞাসু সুভাষকে সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দিলেও এমন কোনো আদর্শের সন্ধান তিনি দিতে পারেননি, যা তার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। সেই কাঙ্ক্ষিত আদর্শের সন্ধান পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলি থেকে। যে জিনিসগুলি তাঁকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হল - স্বামীজীর চিঠি এবং বক্তৃতামালা। জীবনের ব্রত করেছিলেন - 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রটিকে। স্বামীজীর ত্যাগ, সেবাধর্মিতা ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন স্বামীজীর এই 'মানসপুত্র'।

৩

সেবাধর্মিতার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কাছে মানব সেবা ও স্বদেশ সেবা ছিল একে অপরের পরিপূরক। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' - এই ছিল স্বামীজীর সেবাব্রতের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত সুভাষ তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সেই সেবার ভাবটি বজায় রেখে গেছেন। ১৯১৩ সালে কলকাতায় আসার আগে কটকে থাকা কালীন খুব ছোট বয়স থেকেই সেবার প্রতি সুভাষের অকুণ্ঠ ভক্তি পরিলক্ষিত হয়। বেণীমাধব দাস লিখেছেন - স্কুল জীবন থেকেই সুভাষ পরিচিত এক ডাক্তার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকদের অলক্ষ্যে প্রতিদিন ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন বস্তির কলেরা আক্রান্ত রোগীদের সেবার্থে। খালি পায়ে লোকের বাড়ি বাড়ি অর্থ সংগ্রহ করে তাদের চিকিৎসা পথ্যের ব্যবস্থা করতেন। পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সিতে পড়াকালীন ১৯১৫ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে সুভাষ যদুনাথ সরকারের ভাগ্নে হরিশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে দুটি নাইট স্কুল তৈরি করেন। ২২/০৭/১৯১৫ তারিখে বন্ধু চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সুভাষ একটি চিঠিতে লিখেছেন - জেমস সাহেবের নেতৃত্বে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে এবং তাতে তাঁকে সহকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাঁদের কাজ ছিল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে সাহায্য করা। তিনি আরও লিখেছেন - এতে যে আনন্দ, অন্য কোনো কাজে ততখানি নেই। ১৯১৬ খিস্টাব্দে এলগিন রোডে বসবাসকালে তাঁদের বাড়ির সামনে একটি ভিখারি বৃদ্ধা বসে থাকতেন। তাকে দেখে সুভাষের চোখে জল আসতো, কখনো রাত্রে নিজে না খেয়ে একটি রুটির টুকরোকে বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। সকালে সেই রুটিটি তার হাতে তুলে দিতেন। ভিখারিণীটিরও চোখে জল, সুভাষেরও চোখে জল। সুভাষ লিখছেন -ওই ভিখারিণী মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন স্বয়ং দেশমাতৃকা। তাঁর সামনে ভিক্ষা চাইছেন আমায় তুমি শৃঙ্খল মুক্ত করো। আর তিনি তাঁকে সেবায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। ১৯২০ সালে উত্তরভারতে ভয়াবহ বন্যা হলে সুভাষ দুহাজার ভলেন্টিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে। ঠিক পরের বছর ১৯২১ সালে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে দক্ষিণ কলকাতার সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিয়ে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন অনাথদের জন্য। পরবর্তীকালে তিনি যখন জেলে চলে যাচ্ছেন, একটি চিঠি লিখছেন আনন্দবাজার পত্রিকায়, সেটি প্রকাশিত হচ্ছে ২৬ শে অক্টোবর ১৯২৪ খিস্টাব্দে। যেখানে নেতাজী লিখছেন - 'হে আমার ভারতবাসী! দেশমাতৃকার কিছু অনাথ সন্তানদের জন্য আমি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছি। আমার অবর্তমানে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি, তাদেরকে আপনারা রক্ষা করবেন।'

আজও সেই সেবাশ্রমটি অনাথ বালকদের নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে। একদিকে স্বামীজীর রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, তার পাশে নেতাজীর সেবাশ্রম। শুধু দেশ সেবায় নয়, বিশ্বসেবক নেতাজী তাঁর সেবাকাজ পৌঁছে দিয়েছেন দেশের বাইরেও। ১৯৩৮ সাল, কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুভাষ। তখন চিনকে আক্রমণ করেছে জাপান। সেই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সহায়তার অঙ্গীকার করছেন সুভাষ। এটি তাঁর সেবাধর্মের আরেকটা দিক। নেতাজীর জেল সঙ্গী বীরেন্দ্র শাসমল 'স্রোতের তৃণ' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের সেবাধর্মিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন -

'এত সুন্দর একটি মানব, স্বাধীনতা আন্দোলনে যিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবেন পরবর্তী জীবনে, সেই মানুষটির মানব সেবাও যে একটি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সেটি আমাদেরকে জেলের মধ্যে যে ভাবে সেবা করেছেন তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না।'

৪

স্বামীজীর কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। তিনি চেয়েছিলেন যুব সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে এবং চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে। যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যেই একটা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' রূপে নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করছেন সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে সুভাষের মনে এই ধারণা প্রকট হতে থাকে। দেশ সেবাই তাঁর একমাত্র পথ। দেশ মাতৃকার উদ্ধার কল্পে ICS ত্যাগ করে যোগ দিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। ১৯২১, ১৬ই জুলাই দেখা করলেন গান্ধিজীর সাথে। জানতে চাইলেন আন্দোলনের কৌশল। গান্ধিজী সুভাষকে খুশি করতে পারলেন না। সুভাষ দেখা করলেন দেশবন্ধুর সঙ্গে। দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রেই সুভাষ অনুভব করলেন, পেয়ে গেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত নেতাকে। যে মানুষটা জানেন, তিনি কী করতে চান, যিনি নিজের সর্বস্ব দিতে পারেন এবং অপরের সর্বস্ব দাবি করতে পারেন। যাঁর কাছে যৌবনোচ্ছ্বাস দোষ নয়, গুণ। শঙ্করী প্রসাদ বসু লিখছেন, - 'সুভাষচন্দ্রের ভাবগুরু বিবেকানন্দই দেশবন্ধুর প্রতি তাঁর বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হবার কারণ। বিবেকানন্দকে তিনি সাক্ষাতে পাননি, তাঁকেই কিছু অংশে যেন বাস্তবে প্রকাশিত দেখেছিলেন দেশবন্ধুর মধ্যে।'

১৯২১ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারতে এলে সর্বতোভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সুভাষ সেই আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেফতারও হন। এই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে সুভাষের যোগদান। পরবর্তী কালে বহুবার জেলে গেছেন, হয়েছেন ইংরেজ সরকারের চক্ষুশূল। তবুও অভীষ্ট লক্ষে স্থির থেকেছেন স্বামীজীর অনুগত এই সৈনিকটি। পরবর্তীকালে যিনি দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে পাড়ি দেবেন বিদেশে, দেখা করবেন একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে, তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন, গঠন করবেন INA - এর মতো সেনাবাহিনী, দেশে থেকে নয় - দেশের বাইরে থেকে ভারত মাকে স্বাধীন করার পূর্ণ প্রয়াস যিনি করবেন, ডাক দেবেন - 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' গোটা বিশ্ব যাঁকে বিশ্বনেতা 'নেতাজী' হিসেবে চিনবেন - কোথায় পেলেন তিনি এত শক্তি, বুক ভরা আত্মবিশ্বাস ? উত্তর - স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী প্রেমাশানন্দ মহারাজ স্বামীজীকে নিয়ে একখানি গান লিখেছেন, সেখানে বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন - 'কিবা পরিচয় রামকৃষ্ণময়'। নেতাজী সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। 'কিবা পরিচয় বিবেকানন্দময়'; সঠিক ভাবে বলতে গেলে 'কিবা পরিচয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দময়'। একথা কতখানি সত্য জানতে পারি তখন, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে উদ্বোধন সম্পাদকের লেখা ১৯৩৬, ৬ই মার্চ তারিখের চিঠিটি পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব। তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন - অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিনে রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব, একথা বলাই বাহুল্য।'

**তথ্যসূত্র**

১। আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃক প্রকাশিত।
২। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনী ভারত পথিক, মিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২০, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫২
৩। ইউ টিউব বক্তৃতা ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ।

# মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয়

**ড. আদিত্য কুমার লালা**
**প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)**
**গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ**

বাঙালি জাতির বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' গ্রন্থে লিখেছেন, খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে বহু গৌড়ীয় তথা বাংলাদেশের বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের জন্য কাশ্মীরে যেতেন। সেখানে পতঞ্জলি, তর্ক, মীমাংসা প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করে তারা বাংলাদেশে ফিরে আসতেন। বাংলাদেশে বিদ্যাচর্চার সূচনা হয় পালযুগে। পালযুগে বিভিন্ন বিহার ও মহাবিহার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গুরুগৃহে টোল ও সাধারণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা সারা বাংলাদেশে আরও প্রসার লাভ করে। গঙ্গা, জলঙ্গী, ভাগীরথী ইত্যাদি নদীর চড়ায় গড়ে ওঠা নবদ্বীপ শহর বাংলাদেশের অন্যতম বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। নবদ্বীপে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন —

নবদ্বীপ - সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।।
সবে মহাঅধ্যাপক কবি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।
নানা দেশে হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।। (বৃন্দাবন দাস)

ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন -

'গৌড়ের বাদশা হোসেন শা'র শান্তিময় শাসনের ফলে দেশে আবার শাস্ত্রচর্চার সুবিধা হইয়াছিল; নবদ্বীপেও ক্রমশ অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোও এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। পঞ্চদশ শকাব্দের প্রথম দিকে মহেশ্বর বিশারদ ও অন্যান্য পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন।'

পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আচার্য এবং সমাজের ধনী ও জমিদার শ্রেণীর উদ্যোগে বহু টোল ও পাঠশালা স্থাপিত হয়। সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আচার্যগণ সংস্কৃত শিক্ষা দান করার উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়িতে কিংবা গ্রামস্থ চণ্ডীমণ্ডপে টোল প্রতিষ্ঠা করতেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় সমাজের উচ্চবর্ণের বিদ্যার্থীরা পড়াশোনার জন্য টোলে ভিড় জমাতেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত কাব্য থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণ সন্তান চৈতন্যদেব পিতার হাত ধরে বিদ্যালাভের জন্য নবদ্বীপের এক টোলে ভর্তি হয়েছিলেন —

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যেহেন সান্দীপণি।।
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিদ।

তাঁর ঠাঁই পড়িতে প্রভুর সমীহিত ।। (বৃন্দাবন দাস)

সমাজের ধনী ও জমিদার শ্রেণী পোষিত পাঠশালায় উচ্চ-নীচ সব বর্ণের বিদ্যার্থীগণ বিদ্যালাভের সুযোগ পেতেন। এই সব পাঠশালায় বেতনভুক উপাধ্যায়গণ শিক্ষাদানের কাজে রত থাকতেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের নদীয়াখণ্ডে শ্রীহট্টের বর্ণনায় তখনকার পাঠশালার এক সামগ্রিক রূপচিত্র ধরা পড়েছে -

শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্ব্ব সুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপম।।
দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
দেউল দেহারা মঠ নানা পুষ্পোদ্যান।।
সুতার পঞ্চম ঘর নগর চাতর।
ইষ্টক রচিত দ্বার প্রাচীর ভিতর।।
নাইশাল পাঠশাল চৌখণ্ডী বাঙ্গালী।
ধ্বজ কল হংস পারাবত করে কেলি ।। (জয়ানন্দ)

পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয়গুপ্তও তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ বণিকের ছয় পুত্রের পড়াশোনার কথা বলতে গিয়ে পাঠশালার কথা উল্লেখ করেছেন -

ছোট জন নহে চান্দ রাজ ভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা।।
নানা দেশে পাঠ সব, নানা দেশে ঘর।
সোনাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর।।
কেহ কাব্য শাস্ত্র পড়ে, কেহ ব্যাকরণ।
সব হইতে যোগ্য চান্দর পুত্র ছয়জন।।
একদিকে ছয়ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা।। (বিজয়গুপ্ত)

চাঁদ বৈশ্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাই তাঁর পুত্রগণ পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায়, মধ্যযুগে পাঠশালা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের সব ধরনের মানুষের মধ্যে দ্রুত বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটতে থাকে।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (টোল ও পাঠশালা) ভর্তি করা হত পাঁচ বছর বয়সে। বিদ্যার্থীদের পাঠশালায় পাঠানোর আগে অভিভাবকগণ বাড়িতে পণ্ডিত ডেকে শুভক্ষণ নির্ধারণ করে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। সাধারণতঃ বছরের কোনো শুভদিন কিংবা মাঘ মাসের শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজার দিনে অভিভাবকগণ গৃহে শিশুদের হাতে খড়ি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যে দেখতে পাই, গৃহে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর রাম বশিষ্ঠের টোলে পাঠ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন -

পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি।
পড়িতে পাঠন রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী।। (কৃত্তিবাস ওঝা)

মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই, গৃহে পুত্র শ্রীমন্তের হাতেখড়ি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য খুল্লনার নির্দেশে দুবলা দাসী টোলের পণ্ডিত শ্রীহরিকে ডেকে আনেন -

দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।
শুভক্ষণ গণিঞা ছ্যালাকে দিল খড়ি।। (মানিক দত্ত)

তখন বিদ্যানুরাগী পিতামাতাগণ সন্তানের হাত ধরে টোলে বা পাঠশালায় শিশুদের পৌঁছে দিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে

বহু মিনতি জানিয়ে শিশুর প্রতি যথাযথ নজর, পড়াশোনা ও সদাচার শেখানোর জন্য অনুরোধ করতেন। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেবকে টোলে পৌঁছে দিয়ে তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র কী বলেছিলেন তা উল্লেখ করে লিখেছেন -

মিশ্র বলে পুত্র আমি দিনু তোমা স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে।। (বৃন্দাবন দাস)

অনুরূপ অনুরোধ চিত্র পূর্ববঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই জন কবি দ্বিজরামদেব ও ভবানীশঙ্কর দাসের কাব্যেও পাওয়া যায়।

দ্বিজরামদেব ঃ আজ হোতে সমর্পিলু তোমার চরণ।
জ্ঞান গুণ দিয়া শিশু কর পরিজন।।
ভবানীশঙ্কর দাস ঃ খুল্লনাএ বোলে বিপ্র শুন নিবেদন।
তোহ্মার চরণে শুনু কৈলুম সমর্পণ।।
পড়াও তনয় মোর শুন দ্বিজবর।
মানসে করিয়া জ্ঞান জেহেন কিঙ্কর।।

সুচতুর ধনী অভিভাবকগণ গুরুর কাছে এরূপ অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি বিদ্যার্থীর প্রতি উপযুক্ত নজর ও শিক্ষার বিনিময়ে গুরুকেও তিনি যে বঞ্চিত করবেন না, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে পুরস্কৃত করবেন সে বিষয়েও আশ্বস্ত করতেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার ইঙ্গিত আছে -

জত চাহ দিব ধন নিবেশ করিয়া মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান । (মুকুন্দ চক্রবর্তী)

২

টোল ও পাঠশালায় তখন অক্ষর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থীর পড়াশোনা শুরু হত। তারপর অক্ষর পরিচয় হলে উচ্চারণ করে পড়ানো হত। তারপর ক, খ, গ, ঘ এই রূপে চৌত্রিশটি অক্ষর লিখিয়ে পড়ানো হত -

ক খ চৌতিশাক্ষর কাঠতে লেখি । (জয়ানন্দ)

বিদ্যার্থীর অক্ষরজ্ঞান যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে বারোফলা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে শিক্ষার্থীকে আঙ্ক, আষ্ক, ধাতু, সন্ধি, সমাস, শব্দতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান দান করা হত।

জয়ানন্দ ঃ ক খ আঙ্ক আস্থ সিদ্ধি অষ্ট ধাতু পড়ি।
অষ্ট শব্দি পড়িয়া ছাড়িল রামখড়ি।।
কৃত্তিবাস ওঝা ঃ ক খ গ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি।

তারপর বিভিন্ন ব্যাকরণ ও টীকা পড়িয়ে বাক্যগঠন ও লিখন বিষয়ে দক্ষ করে তুলে বিদ্যার্থীর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত করা হত।

প্রাথমিকের পর ইচ্ছুক ও কৃতি বিদ্যার্থীদের নিয়ে শুরু হত উচ্চতর পাঠক্রমের পড়াশোনা। তখন উচ্চতর পাঠক্রিয়ার সব প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। গুরু বা শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষা নিয়ে বিদ্যার্থীর অধীত জ্ঞান যাচাই করে তবেই উচ্চতর পাঠক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দিতেন। উচ্চতর পাঠক্রমে বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থ (অমরসিংহ, ভর্তিকাব্য, রঘুবংশ, নৈষধচরিত ইত্যাদি) অলঙ্কার, জ্যোতিষশাস্ত্র, অষ্টাদশপুরাণ সহ নানা শাস্ত্রীয় বিষয়, ন্যায়দর্শন, মীমাংসা সহ বিভিন্ন বিদ্যা (চৌষট্টি বিদ্যা) বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এই পাঠক্রম শেষেও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে টোল বা পাঠশালার শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারতেন। মধ্যযুগের মনসাবিজয় কাব্যের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের কবি

মাধবাচার্য ও পরশুরামের কাব্যের বর্ণনা থেকে মধ্যযুগের পাঠদান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা যায়। বিপ্রদাস পিপিলাই লখিন্দরের বিদ্যাশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন -

শাস্ত্র শাল যাইলেক বালা লখিন্দর
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তারপর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে।
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান
জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।
সকল সন্ধান শিখে ইঙ্গিতে সকল
লক্ষমাত্র উপধ্যায় পড়াএ অনুবল
পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা সব একে একে।
জানিল সকল বিদ্যা কহিল কৌতুকে ।। (বিপ্রদাস পিপিলাই)

কবি পরশুরাম ও মাধবাচার্য কৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, -

(ক) থাকিয়া গুরুর দ্বারে রামরিসিকেস
পড়িলা চৌষট্টি বিদ্যা অশেষ বিশেষ।। (পরশুরাম)
(খ) সবহুঁ সাধন বেদ ধর্ম্ম রাজনীতি।
ন্যায় দর্শন ছয় মীমাংসা প্রভৃতি।।
একেবারে সর্বশাস্ত্রে করিলেন দৃষ্টি।
চৌষট্টি দিবসে বিদ্যা পড়িল চৌষট্টি।। (মাধবাচার্য)

প্রসঙ্গত বলতে হয়, বর্তমানকালের মতো মধ্যযুগের পাঠক্রমেও নমনীয়তা ছিল। যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে পাঠক্রমে বিভিন্ন সময়ে নানা পরিগ্রহণ ও পরিবর্জন করা হত। ষোড়শ শতকের কবি বিপ্রদাস, জয়ানন্দ প্রমুখের বর্ণিত পাঠক্রমের সঙ্গে অনেক পরের কবি দ্বিজ রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গলে (আনুমানিক ১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত) কাব্যে বর্ণিত পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা করলে তা স্পষ্ট বোঝা যায় -

সকল দেশের ভাষা ওঝা শিখাইল।
অঙ্ক শাস্ত্র বিশেষিয়া শিখাইয়া দিল।।
যব রতি মাসা তোলা সের আদি মান।
বৈশ্য বিদ্যা ওঝা তাকে সব দিলে দান।। (রামানন্দ যতি)

উপরের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার কারণেই পাঠশালার অঙ্ক ও বিদেশী ভাষাশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা যায়, অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে বিদেশী বণিকের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কারণে সমাজে বৈশ্য বিদ্যা শিক্ষার (অঙ্ক ও বিদেশী ভাষা) প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রামানন্দ যতির বর্ণনায় তারই আভাস আছে।

সময় যত এগিয়েছে সমাজে কাজের পরিসর ও ধরণ তত বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষপর্ব থেকে তাই পাঠশালায় শিক্ষার্থীদের মানসিক দিক থেকে দৃঢ় ও সক্ষম করে তোলার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত পাঠ্যক্রমের তালিকায় মল্লবিদ্যার সংযুক্তি সে কথাই প্রমাণ করে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি মানিকরাম

গাঙ্গুলি লিখেছেন -

ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে।।
বাকি নাই শাস্ত্র কিছু সকল পড়িলা।
সেই কথা নরোত্তম সকল কহিলা।।
মল্লবিদ্যা দোঁহাকার করায় অভ্যাস।
ভাল হয় ভূপতি আমার শুন ভাষ ।। (মানিকরাম গাঙ্গুলি)

সর্বোপরি বলা যায়, মধ্যযুগের পাঠক্রমে প্রথম দিকে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার উপর প্রাধান্য দেওয়া হলেও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাতে নানা সংযোজন বিয়োজন ঘটানো হত। সুতরাং বিদ্যাচর্চা বিষয়ে মধ্যযুগের সমাজ যে একেবারে উদাসীন ছিল, তা নয়।

৩

মধ্যযুগের সাহিত্যগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, তখন টোল ও পাঠশালায় যত্নসহকারে পাঠদান করা হত। শিক্ষার্থীগণ পাঠশালায় মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ করতেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন -

পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমুলে সন্ধিবৃত্তি
রাত্রি দিন করএ ভাবনা
নিবিষ্ট করিয়া মন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা ।। (মুকুন্দ চক্রবর্তী)

মধ্যযুগে টোল বা পাঠশালায় পড়াশোনার একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের পুত্রসম ভালোবাসতেন -

শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাশ।। (বৃন্দাবন দাস)

যত্ন করে পড়াতেন এবং শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা বিকাশের উপর নজর দিতেন, চৈতন্যভাগবত কাব্যে দেখা যায় গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে তর্ক করেছেন। চণ্ডীকবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও অনুরূপ চিত্র আছে -

সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মন ।। (মুকুন্দ চক্রবর্তী)

এই তর্ককাণ্ডে কোনো শিক্ষার্থী যদি গুরুর মতামত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেন বা নিজের কোনো মত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে গুরু খুব খুশি হতেন। তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক থাকলেও কখনো কোনো শিক্ষার্থী অসদাচরণ করলে শিক্ষক শাস্তিদানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না -

ইহা শুনি গুরু মারে পুস্তকের বাড়ি ( জয়ানন্দ)

তবে এই সব শাস্তি চিত্র ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র, সার্বিকভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালোবাসতেন।

তখন পাঠশালা ও টোলে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যার্থীরা নিজেদের মধ্যে পড়াশোনা বিষয়ে আলোচনা করতেন। ভবানীশঙ্কর দাস তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তের পাঠশালায় বসে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে পড়াশোনা বিষয়ক আলোচনায় এই রূপ চিত্র উপস্থাপন করে লিখেছেন -

আর এক দিনে শ্রীমন্ত সদাগরে।
পড়ুয়ার সঙ্গে বসি শাস্ত্রবাদ করে।। (ভবানীশঙ্কর দাস)

অনুরূপ চিত্র বৃন্দাবন দাসও তাঁর চৈতন্যভাগবত কাব্যে উল্লেখ করেছেন। নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে স্নান করায় সময় তাঁর প্রাণের পড়ুয়ারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে খেলাচ্ছলে নিজেদের পড়াশোনা ও জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে গেছেন -

এই মত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যারসে খেলা খেলে।। (বৃন্দাবন দাস)

প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে একাধিক টোলের বিদ্যার্থীরা জড়ো হয়ে পড়াশোনা বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনায় এতখানি গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন যে এক টোলের বিদ্যার্থী অন্য টোলের বিদ্যার্থীর নিকট পরাজিত হলে মেজাজ হারিয়ে নিজেদের এমনকি একে অপরের গুরুকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি শুরু করতেন -

কেহ বলে তোর গুরু কিবা বুদ্ধি তার।
কেহ বলে এই দেখ আমি শিষ্য যার।।
এই মত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল পেলাপেলি তবে দেয় বালি।। (বৃন্দাবন দাস)

গুরু মহাশয়ের তীক্ষ্ণ নজর ও সহৃদয় মনোভাবের কারণে তখন বেশীর ভাগ পড়ুয়ায় পড়াশোনা বিষয়ে খুবই সিরিয়াস ছিলেন। পারিবারিক কোনো কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটলে তারা পরিবারের প্রতি বিরূপ আচরণ করতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, চৈতন্যদেবের পিতা সম্পূর্ণ পারিবারিক কারণে চৈতন্যের পড়াশোনা বন্ধ করে দিলে চৈতন্য পিতার সেই কাজের প্রতিবাদ জানান এভাবে -

প্রভু বোলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মুর্খ বিপ্র জানিবে কেমতে।। (বৃন্দাবন দাস)

চৈতন্যের পড়াশোনার প্রতি এই আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখে মাতা শচীদেবী তখন পুত্রের পক্ষ নিয়ে স্বামীর নিকট যুক্তি উপস্থাপিত করে বলেন -

শচী বোলে মুর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মুর্খের কন্যাও নাহি দিবে কোন জনে।। (বৃন্দাবন দাস)

পড়াশোনার যাতে বিঘ্ন না হয় তার জন্য মাতাপুত্রের এই একনিষ্ঠ প্রতিবাদে চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র মত পরিবর্তনে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি আদায় করে চৈতন্য এরপর দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশোনা করে অচিরেই নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি রূপে পরিচিত হন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যদেবের এই চিত্র অবশ্য মধ্যযুগের সব শিক্ষার্থীর একমাত্র চিত্র নয়। কোথাও কোথাও এর বিপরীত চিত্রও পাওয়া যায়। কবি লোচন দাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন, পিতা জগন্নাথ মিশ্র পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়ার কারণে চৈতন্যকে শাসন করতে উদ্যত হলে -

এহা বলি জগন্নাথে হাতে ছটি করি।
তর্জ্জন করিতে শশী তার হাতে ধরি।। (লোচন দাস)

মা শচী দেবী পুত্রের পক্ষে স্বামীর কাছে ভালো করে পড়াশোনার অঙ্গীকার করে চৈতন্যকে পিতার তর্জনের হাত থেকে রক্ষা করেন -

হেনকালে শচীদেবী ব্যাকুল হৈঞা।
নিষেধ করিল মিশ্রে মিনতি করিঞা।।
না মারিহ পুত্রে মোর না খেলিব আর।
সর্ব্বদা পড়িব কাছে থাকিব তোমার।। (লোচন দাস)

জগন্নাথ মিশ্র অতঃপর শান্ত অবস্থায় শিশু চৈতন্যকে নানাভাবে বুঝিয়ে পড়াশোনার প্রতি তার মন ফেরানোর চেষ্টা

করেন -

পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে।
পড়িলে শুনিলে বাপু লোকে ভাল বোলে।। (লোচন দাস)

৪

পড়াশোনার কাজে শিক্ষার্থীগণ তখন তালপাতা ও তেরেট পত্রকে লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতেন। চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, -

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাতাল চালে রাখিল গুজিয়া।। (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

অন্যদিকে চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের কবি জয়ানন্দ লিখেছেন, -

তাড়্যাত পাতের বিচিত্র পুথি তাহে রূপার চাকি।
পাটের ডোর চন্দনে পরিপাটী ।। (জয়ানন্দ)

তখন কলম হিসেবে ব্যবহার করা হত শর বা খাগের কলম।

কালি কী করে প্রস্তুত করা হত বা কালি তৈরির উপকরণ কেমন ছিল মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যের তার কোনো পরিচয় পাওয়া না গেলেও ডঃ পঞ্চানন মন্ডল তাঁর পুথি পরিচয় গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কালি তৈরির উপকরণ বিষয়ক যে সব ছড়ার উল্লেখ করেছেন তার একটি উল্লেখ করলেই সে বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় -

লোহা লোহা লোহার পুরি আকাঙ্গার যাবে কুরি
গাবের ফল হরিতকী গার্জ্জন আমলকী
বাবলা ছাল ছটির রস ডালিম সেচে করিবে রস
তেলার কর্য এক আলি চার যুগলা উঠবে কালি

( পঞ্চানন মণ্ডল )

৫

মধ্যযুগে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তার প্রেক্ষিতে বলতে হয় হিন্দু সমাজে টোলের সমান্তরালে মুসলমান শিক্ষার্থীগণ মক্তবে নিজেদের ধর্ম ও আচার বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। তাঁরা হিন্দুসমাজের শিক্ষার্থীর মতো বিসমিল্লাহখানি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চায় অংশগ্রহণ করতেন। তখন মক্তবে বিদ্যাচর্চার প্রকৃতি কী রূপ ছিল সে বিষয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল জলিল এক পূর্ণাঙ্গ তথ্য হাজির করেছেন। তিনি লিখেছেন - 'মকতবে মুসলমান ছেলে মেয়েদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল নামাজ ও অজু। এছাড়া কোরাণ মুখস্থ করা এবং হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করাও ছিল শিক্ষার অন্যতম বিষয়। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী। তবে এ দেশের মুসলমান ছেলেমেয়েরা আরবীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসী ও দেশীয় ভাষা বাংলা শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিত।

তবে সপ্তদশ শতক থেকে মক্তবের পাশাপাশি পাঠশালায়ও মুসলমান শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার জন্য যেতে শুরু করেন। সপ্তদশ শতকের কবি দৌলত উজির বাহারাম খাঁ রচিত 'লায়লী মজনু' কাব্য থেকে জানা যায় তখন পাঠশালায় হিন্দু মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীগণ পড়াশোনার জন্য যেতেন -

সুন্দর বালকগণ অতি সুরচিত।
একস্থানে সভারে পড়এ আনন্দিত।।
সেই পাঠশালাতে পড়এ কত বালা।
সুচরিতা সুললিতা নির্ম্মলা উজ্জ্বলা।।
সে সব সুন্দরী মধ্যে এক অকুমারী।

মর্ত্যেতে নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।। (দৌলত উজির বাহারাম খাঁ)

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হিন্দু নারীগণ যে সপ্তদশ শতকেই বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণে প্রথম এসেছেন তা কিন্তু নয়। নিজ গৃহ পরিবেশে গুরুজনদের কাছে তাঁরা আরও আগে থেকে বিদ্যাচর্চা করতেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ কাহিনিতে ফুল্লরার এই কথায় -

ভারত পুরাণ ক্রমে শুনেছি পণ্ডিত ধামে
অবনীতে দারা বেদবতী
জানিলে জানিতে পার বলিলে বচন ধর
যে রূপে পালিল স্বামী সতী ।। (মুকুন্দ চক্রবর্তী)

বণিক খণ্ডের কাহিনিতে পদ্মাবতীর পত্র লেখার বর্ণনায় -

কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে পদ্মাবতী। (মুকুন্দ চক্রবর্তী)

তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, মধ্যযুগের সূচনালগ্ন থেকে হিন্দু রমণীগণ বিদ্যাচর্চায় অংশগ্রহণ করলেও পাঠশালায় পুরুষ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একসঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ করা শুরু করেন খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে।

৬

মধ্যযুগে পড়াশোনা শিখে মানুষ কিরূপ উপার্জনমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হতেন তারও আভাস মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যে পাওয়া যায়। তখন পড়াশোনা শিখে অনেক শিক্ষার্থী অধ্যাপনার কাজ করতেন, কেউ বা ধনী ব্যক্তির অধীনে কাজ পেতেন, আবার অনেকের ভাগ্যে কিছুই জুটত না। তাতে শিক্ষার্থীদের মনে ক্ষোভ ও খেদ উভয়ই সৃষ্টি হত। চৈতন্যভাগবত কাব্য থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তি হয়েও মনঃপূত কাজ না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন -

পড়িয়াও আমার ঘরেত নাহি ভাত।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে যে বা নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।। (বৃন্দাবন দাস)

বর্তমান কালের মতো বহু শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী তখন গৃহশিক্ষকতা (Private tuition) করতেন। সম্পন্ন অভিভাবকগণ নিজ সন্তানের প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়ার কারণে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতেন। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায়। শ্রীমন্ত দিনের বেলায় পাঠশালায় পাঠ নিতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গৃহশিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করতেন -

দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।
রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে।। (মানিক দত্ত)

বেকার যুবক-যুবতীর এই কর্মচিত্র বহু যুগ পেরিয়ে আজকের সমাজজীবন সমানভাবে প্রবহমান আছে।

বস্তুত মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের এই আলোচনা থেকে তৎকালীন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার যে সার্বিক চিত্র অনুধাবন করা যায় তা কোন অংশে অনুজ্জ্বল নয়। বর্তমান যুগের মতো সে যুগে ছাপাখানা, কাগজ, কালির প্রচলন ছিল না। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে মধ্যযুগের শিক্ষার্থীগণ যে ভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় ও গুরুমশাইদের উদ্যোগে নিজেদের বিদ্যার্জনের কাজে ব্রতী রেখেছিলেন তা প্রশংসনীয়। বাঙালি মননচর্চার ইতিহাসে তাঁদের এই নিষ্ঠা ও প্রয়াস চিরকাল স্মরণযোগ্য।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৫২
২। মুহম্মদ আবদুল জলিল ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৬, পৃষ্ঠা - ১৩০

**কবিতার উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে এমন গ্রন্থগুলি হল ঃ**

- কৃত্তিবাস ওঝা ঃ রামায়ণ, সুধাংশু শেখর দে কর্তৃক প্রকাশিত, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬
- জয়ানন্দ ঃ চৈতন্যমঙ্গল, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৬
- দৌলত উজির বাহারাম খান ঃ লায়লী মজনু, আহমেদ মাহমুদুল হক কর্তৃক প্রকাশিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২
- দ্বিজ রামদেব ঃ অভয়া মঙ্গল, আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫৭

● পরশুরাম ঃ কৃষ্ণমঙ্গল, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৫৭
● পঞ্চানন মণ্ডল ঃ পুঁথি পরিচয়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শান্তিনিকেতন, ১৩৫৮
● বিপ্রদাস পিপিলাই ঃ মনসাবিজয়, সুকুমার সেন সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা ১৯৫৩
● বৃন্দাবন দাস ঃ চৈতন্য ভাগবত, সুকুমার সেন সম্পাদিত সাহিত্য একাডেমি, নতুন দিল্লী, ২০০৩
● ভবানীশঙ্কর দাস ঃ মঙ্গল-চণ্ডী, পঞ্চালিকা, রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির হইতে
শ্রী রামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩২৩
● মাধবাচার্য ঃ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বঙ্গবাসী, স্টীম মেসিন প্রেস, কলিকাতা ১৩১০
● মুকুন্দ চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫
● মানিক দত্ত ঃ চণ্ডীমঙ্গল, সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং, ১৩৮৪
● মানিকরাম গাঙ্গুলি ঃ ধর্মমঙ্গল, বিজিত কুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা ১৯৬০
● রামানন্দ যতি ঃ চণ্ডীমঙ্গল, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা - ১৩৪৫
● লোচনদাস ঃ চৈতন্যমঙ্গল, মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত, গৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৪

# বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা ঃ একালের চোখে

**ড. নাড়ুগোপাল দে**
**প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)**
**সিধোকানো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, ভাবুক শিল্পী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণ সন্তান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৮৫৭) প্রথম বিএ; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর। তাঁর মুখাবয়বের জ্যোতি উনিশ শতকের বাঙালিকে পথ দেখায়। তাঁর 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহামন্ত্র। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর থাকে প্রবন্ধ বা উপন্যাসের পৃষ্ঠায়। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রসঙ্গে অন্যের মতকে সমর্থন করেন না ঃ 'সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয়শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।'[১] তিনিই আবার 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' না থাকার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঃ 'সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই।'[২] তিনিই আবার সাংখ্যদর্শনের ভূয়োসী প্রশংসা করেছেন ঃ 'কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কাল শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ।'[৩] এই বঙ্কিমই আবার 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বিষয় আলোকপাত করেন ঃ 'প্রথম কোলেবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।'[৪] আবার বঙ্কিম বিভিন্ন পুরাণ ও মহাভারত অধ্যয়ন করে কৃষ্ণচরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এ এক অসাধ্য সাধনের কাজ। বঙ্কিম লিখেছেন ঃ 'সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ — ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্ত্রী, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।'[৫] আবার তিনি স্বদেশপ্রীতিকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছেন। গুরুর মুখ দিয়ে তিনি বলছেন ঃ 'সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশনীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'[৬] তাঁর জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর আছে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে ঃ ''এ জীবন লইয়া কি করিব?'' ''লইয়া কি করিতে হয়?'' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। .... এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ''জীবন লইয়া কি করিব।'' এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'[৮] — উনিশ শতকে এই পথ-হারানো স্বদেশবাসীকেই তিনি সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন — যাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্বাধিক উন্নতি হয়, তাই ধর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি হুগলি কলেজে পড়বার সময় বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে দেশ বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল দর্শন সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত বইও অধ্যয়ন করে জ্ঞানের গভীরতা বাড়িয়েছেন। এইভাবে অর্জিত বহুমুখী অধীত জ্ঞান বঙ্কিম পরবর্তী কালে সাহিত্যে রেফারেন্স হিসাবে প্রায়শই ব্যবহার করেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। পঠনপাঠন নির্ভর শিক্ষা প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা যায়, কিভাবে বাঙালিকে সাহিত্য চর্চা করতে হবে, সে সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন 'বাঙালীর নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে। কিভাবে ইতিহাস চর্চা করতে হবে, সে সম্বন্ধে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন 'বাঙালীর ইতিহাস,' 'বাঙালীর ইতিহাসের ভগ্নাংশ,' 'ভারত - কলঙ্ক' প্রভৃতি তাঁর ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধে। সাহিত্যে অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই এ বিষয়ে তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন 'অনুকরণ' প্রবন্ধে। লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না বা লোকশিক্ষার বিভিন্ন

দিকগুলি কি কি হবে তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে তিনি এ বিষয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন 'লোক শিক্ষা' প্রবন্ধে। তিনি বাঙালির ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরে বাঙালির চরিত্র শোধন প্রসঙ্গে শিক্ষা দিয়েছেন 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে। উক্ত গ্রন্থের 'বিড়াল' প্রবন্ধে তিনি সাম্যবাদী ধারণার বীজ বপন করে সাম্যবাদী ধারণার প্রকৃতি নিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে তিনি সঠিকভাবে কোন বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা নিয়ে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। বাঙালির বাহুবল পূর্বে ছিল কি না, বর্তমানে আছে কি নেই বা ভবিষ্যতে হবে কিনা, তা নিয়ে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন 'বাঙালির বাহুবল' প্রবন্ধে। সঙ্গীত কাকে বলে, সুর কি — এ বিষয়ে তিনি 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। স্ত্রীলোকের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুণাগুণ বিষয় তিনি শিক্ষা দিতে গিয়ে লিখলেন 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রবন্ধ। কিভাবে সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে হয়, তার জন্য তিনি শিক্ষা দিতে গিয়ে লিখলেন 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রভৃতি প্রবন্ধে। বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং এ বিষয় শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি লিখলেন 'বিজ্ঞান রহস্যে'র বিভিন্ন প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র আপামর বাঙালিকে ঐতিহ্য বিষয় সচেতন করতে গিয়ে লিখলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, 'কৃষ্ণচরিত্রে'র রীতিমতো ইতিহাস -সমালোচনা এই প্রথম। এই গ্রন্থ লিখে বঙ্কিম বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালিকে শিক্ষা দিয়েছেন। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র কিভাবে টীকা ভাষ্য দিতে হয় — এ বিষয় তিনি বাঙালিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রবন্ধে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। এ হলো বঙ্কিমের শিক্ষা ভাবনার টুকরো টুকরো সব ছবি। বঙ্কিমের শিক্ষা ভাবনার এটা একটা দিক।[৯]

শিক্ষা নিয়ে বঙ্কিম গঠনমূলক চিন্তাও করেছেন। গঠনমূলক শিক্ষাভাবনার তাত্ত্বিক রূপটি বঙ্কিম 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। শিক্ষা ভাবনার মূল সূত্রগুলি আমরা উক্ত প্রবন্ধে পাই। এই গঠনমূলক শিক্ষাভাবনা হল বঙ্কিমের শিক্ষা ভাবনার অপরদিক।

শিক্ষাভাবনা সম্পর্কে বঙ্কিম বক্তব্য নিম্নোক্ত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায় ঃ

ক) টোলকেন্দ্রিক দেশজ শিক্ষার ধারা

খ) পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষার ধারা, এবং

গ) লোকশিক্ষার ধারা।[১০]

**ক) টোলকেন্দ্রিক দেশজ শিক্ষার ধারা ঃ** ইংরেজরা এদেশের স্থায়ীভাবে শাসনভার গ্রহণ করার পর ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়। দূরদ্রষ্টা বঙ্কিমের সম্ভবত এই বিশ্বাস জন্মে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রাসী প্রবাহে খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে দেশজ শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী টোল, গুরু-শিষ্য পরম্পরার সার্থক শিক্ষাপদ্ধতি এবং মুখে মুখে ব্যবহৃত অলিখিত সমৃদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার। এই আশংকা তাঁর মনে জেগেছিল। এই কারণে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে এবং প্রবন্ধগ্রন্থে টোলের শিক্ষা পদ্ধতির নানা খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন।

'আনন্দমঠের (১৮৮২ খ্রি.) শান্তিকে বঙ্কিম টোল-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। শান্তির পিতা 'অধ্যাপক ব্রাহ্মণ' ছিলেন। তাঁর একটি টোল ছিল। টোলে ছাত্ররা বাস করতো এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষা লাভ করত। টোলের ছাত্রদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শান্তিও শিক্ষালাভ করতে থাকল। শান্তির টোল-শিক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য : ''দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, শান্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শান্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল। ব্যাকরণের এক বর্ণও জানে না, কিন্তু ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া শান্তির পিতা ''যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি'' বলিয়া শান্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ করাইলেন। শান্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল। অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন।''[১১]

বঙ্কিম এখানে টোলে পুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীরা যে পুরুষদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে সফল হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আনন্দমঠে'র শান্তি চরিত্র। নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে বঙ্কিম সঠিক ও সময়োচিত কাজই করেছেন।

'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪ খ্রি.) উপন্যাসে বঙ্কিম ভবানী পাঠকের মধ্যে দিয়ে টোলের শিক্ষার বাস্তব রূপদান করলেন। এই ভবানী পাঠক একজন টোল-শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, যোগশাস্ত্র এবং পুরাণসহ নানা গ্রন্থে

তিনি পণ্ডিত। এই রকম একজন বিপ্লবী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যিনি অরণ্যের মধ্যে নিরিবিলি অস্তানায় প্রফুল্লর 'জেতে বাগ্দী' কলঙ্কে লাঞ্ছিত মেয়ের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সানন্দে। তিনি শুধু প্রফুল্লকে মাতৃভাষায় সাক্ষর করেন তাই নয়, দেবভাষায় উচ্চশিক্ষা দান করেন।[১২]

বঙ্কিম ভেবেছেন, দেশজ শিক্ষার মধ্যে দিয়েও প্রাচ্য বিদ্যার উচ্চশিক্ষা লাভ করা যায়। এখানে তিনি দেশজ শিক্ষার ধারাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। টোলের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়েও যে উচ্চশিক্ষা লাভ করা যায় তার নজির শান্তি এবং প্রফুল্ল।

■ **স্ত্রীশিক্ষা ঃ**

'সাম্য' (১৮৭৯ খ্রি.) প্রবন্ধগ্রন্থে বঙ্কিম স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ

''তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত;''[১৩]

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বঙ্কিম সবসময় সহানুভূতিশীল ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর' মন্তব্যের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের সদর্থক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব বঙ্কিম বেশ সচেতন ভাবেই অনুধাবন করেছিলেন।

অবরোধ প্রথাকে মেনে না নেওয়ার মধ্যে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের সদর্থক চিন্তা ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে এই প্রথা যে অনিষ্টকর তা বঙ্কিম বুঝেছিলেন। সুশিক্ষিতা হলে একদিকে অনায়াসে নারীরা সমাজের এই বেড়া ভাঙতে পারবে, অন্যদিকে তাঁরা অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এইভাবে বঙ্কিম নারীকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছেন : ''লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে।''[১৪]

■ **জনশিক্ষা ঃ**

'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬ খ্রি.) গ্রন্থে বঙ্কিম শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আপামর সাধারণ সকলের শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নেই। তিনি জনশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে humanist দের ধর্ম পালন করেছেন। বঙ্কিমের ভাষায় ঃ

''চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের অধিকার নাই কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সকল অধিকার। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।''[১৫]

■ **শিক্ষার সঙ্গে ভক্তির যোগ ঃ**

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে শিক্ষার সঙ্গে ভক্তির যোগ দেখিয়েছেন ঃ

''অতএব জগতে শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সব শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।''[১৬]

■ **অন্তঃপুর নারীদের শিক্ষা ঃ**

বঙ্কিম অন্তঃপুর শিক্ষার পরিচয়ও দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'-র তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়তে শিখেছিলেন। তিনি পড়েছেন কাদম্বরী, সুবন্ধুর বাসবদত্তা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ। তিনি লিখতেও জানতেন। মসীপত্রে লেখা 'কুমার জগৎসিংহ'-ই তার প্রমাণ দেয়।[১৭] বিমলাও সুশিক্ষিতা রমণী। ওসমানকে লেখা তার চিঠি এর প্রমাণ।[১৮]আয়েষাও সুশিক্ষিতা নারী, তিনিও লেখাপড়া জানতেন। জগৎসিংহকে লেখা তার পত্রই এর সাক্ষাৎ দেয়।[১৯] মেহের-উন্নিসাও রূপবতী, গুণবতী এবং শিক্ষিতাও ঃ

''কোন প্রকার বিদ্যায় তৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্য গীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন।''[২০]

'রাজসিংহের চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারীও শিল্প সংস্কৃতি মনস্ক এবং শিক্ষিতাও। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ খ্রি.) উপন্যাসে সুভাষিণীর মেয়ে

হেমার ছড়া আবৃত্তি করা,[২১] রাজসিংহে (১৮৮২ খ্রি.) চঞ্চলকুমারীর দোঁহা আওড়ানো,"[২২] চঞ্চলকুমারীর শিবিকাবাহকদের একজনের দোঁহা গাওয়া,[২৩] যোধপুরী বেগমের দোঁহা আওড়ানোর[২৪] মধ্যে দিয়ে অন্তঃপুর নারীদের বহুবিধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তঃপুর নারীদের বিচরণক্ষেত্র অন্তঃপুর হলেও তাঁরা শুধুমাত্র 'সতীর দেবতা পতি জীবনের সার/পূজিতে এসেছি ভবে চরণ তাহার' ধরনের চরিত্র নন। এই নারীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সদ্য পড়তে শেখা নারী, এঁদের মূল্যবোধও কম নয়। বঙ্কিমের অন্তঃপুর নারীরা লেখাপড়া করা মেয়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে এঁরা পারদর্শী, তাঁরা নিজেরাই কবিতা লেখেন, ছড়া কাটেন, চিত্রপট অংকন করেন, পত্র রচনা করেন, কাপড়ের উপর কারুকার্য করতে জানেন, নৃত্য গীতে পারদর্শী। সর্বোপরি, অন্তঃপুর নারীরা নারীশিক্ষামনস্ক। তাঁদের মধ্যে অদ্ভুত জীবনী শক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত নারীদের বঙ্কিম শিক্ষার আলো দেখাতে চেয়েছেন। সমাজে তাঁদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। মেয়েদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু তিনি দিয়েছেন। বঙ্কিম এখানে নারীচরিত্রগুলির বিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখানে বঙ্কিম একজন প্রগতিশীল মানুষ, চিন্তাবিদ মনীষী; বাংলা রেনেসাঁসের অগ্রপথিক।[২৫]

**■ পুরুষদের শিক্ষা ঃ**

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রগুলি দেশজ শিক্ষায় শিক্ষিত। জমিদার শ্রেণির চরিত্রগুলির শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, জ্যোতিষী প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি দেশজ শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। তিনি কাল্পনিক বা নিজ সৃষ্ট চরিত্রের শিক্ষণভাবনা বা তাদের পড়াশুনা সম্বন্ধে নিজ মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র শশীশেখর ওরফে অভিরাম স্বামী যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তা আমরা জানতে পারি। তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়তে শিখেছিলেন।[২৬] 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মাধবাচার্য ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। হেমচন্দ্র তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন।[২৭] পশুপতি সংস্কৃত জানতেন। তাঁর পিতা ছিলেন শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ।[২৮] তারাচরণ একটি মিশনারী স্কুলে ইংরেজি শিখতে লেগেছিলেন।[২৯] দেবেন্দ্রও লেখাপড়া জানা ব্যক্তি, কিন্তু তিনি রূপতৃষ্ণার গুণে কোলকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয় অতৃপ্ত বিলাস-তৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হলেন।[৩০] শ্রীশচন্দ্র 'আপিসে' কাজ করেন। পড়ার জন্য বাড়িতে ইংরেজি সংবাদপত্র নেন।[৩১] বোঝা যায় তিনি ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি। কেরাণীগিরির চাকরি করেন। রমণবাবু ('ইন্দিরা') ''উচ্চ শিক্ষায়'' শিক্ষিত মানুষ।[৩২] মীরকাসেম চন্দ্রশেখরের কাছে জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন।[৩৩] চন্দ্রশেখর সংস্কৃত ও বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি অধ্যয়ন করতেন ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ।[৩৪]

**■ পাশ্চাত্য তথা ঔপনিবেশিক শিক্ষা ঃ**

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষায় (ইংরেজি শিক্ষায়) শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর শিক্ষারম্ভ হয়েছে এফ.টিডের ইংরেজি স্কুলে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ছ'বছর বয়সে।[৩৫] এরপর ক্রমে হুগলি কলেজে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাঠ নেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮-তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ পরীক্ষা প্রবর্তন হয়। ১৮৫৮-র এপ্রিল মাসের গোড়ায় বি.এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্য বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮-র ১১ ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে বি.এ উপাধি প্রদান করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে উপনিবেশিক শিক্ষাধারায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি আবার বাংলার প্রাচীন পণ্ডিতস্থান 'নব-নবদ্বীপ' ভাটপাড়ায় বিখ্যাত 'টোলের-বাড়ি' তে পণ্ডিত জয়রাম ন্যায়ভূষণের কাছে রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার পাঠ নিয়েছেন।[৩৬]

বঙ্কিম পূর্বপরিকল্পনা মাফিক কোনো একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে লেখেননি। তিনি কোনো একটা বিষয় নিয়ে যা ভেবেছেন, তাই লিখেছেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়কে সঞ্জীবিত করতে প্রয়োজনে তিনি রেফারেন্স হিসাবে বিভিন্ন বিষয় এনেছেন। এই জন্যই, যেমন, সাহিত্যের বিষয়ে রেফারেন্স হিসাবে ঢুকে পড়ে কখনো ইতিহাস, কখনো শিক্ষা, কখনো নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়, বা কখনো অর্থনীতির বিষয়ে ঢুকে পড়ে সাম্য ভাবনার ভারী জিনিস। বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনে সেরকম কোনো কাজ বা দশা ধরা পড়েনি, যেখানে পৃথক পৃথক ভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চর্চা আছে।[৩৭]

পাশ্চাত্য তথা ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে নানা ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধে বা প্রবন্ধগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে।

এবং শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলি মণিমুক্তার মতোই আজও উজ্জ্বল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয় ধরে ধরে বঙ্কিম উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাচীনা এবং নবীনা' প্রবন্ধে প্রাচীনের এবং নবীনের গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তাতে ইংরেজি শিক্ষার সমালোচনাই ধরা পড়েছে ঃ ''প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব?''[৩৮]

ইংরেজিকে কেরাণীগিরির ভাষা বলে বঙ্কিম প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনাই এখানে করেছেন।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষার সমালোচনা করেছেন ঃ ''লোক প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। তাই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে।.... গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশলী, বাগ্মী বা সুলেখক — ইহাই বাঙালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক প্রবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা আর বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে।....

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে — সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ?

গুরু।... তৃতীয় দোষ শুন। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন বৃত্তির স্ফূরণ নহে।''[৩৯]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বঙ্কিম আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর তিনটি দোষের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, আমাদের নানা বৃত্তিসমূহের প্রতিই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো একটি বৃত্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া চলবে না তাহলে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্তি ঘটবে না। নানা বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাই মঙ্গলকর। এই শিক্ষা প্রণালীর আরও একটি ভুলের কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন — স্পেশালাইজেশনের প্রতি বা বিশেষ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। সকলের সব বিষয় শিখবার দরকার নেই। বঙ্কিমের সময়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিকাঠামোর ভিত তখনো মজবুত হয়নি। স্বভাবতই যারা অভিভাবক তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে। বঙ্কিম কিন্তু এই সময় একটা নীতি নির্ধারণ করেছেন — যে শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে এবং শিক্ষার্থী সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করবে, সেই শিক্ষাকেই তিনি গ্রহণ করতে বলেছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এই চিন্তা সময়োচিত এবং সঠিক। তবে, আজকের দিনের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বঙ্কিমের শিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত ভাবনা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্পেশাললাইজেশনের গুরুত্ব অধিক।

বঙ্কিম শিক্ষার সঙ্গে ভক্তির যোগ দেখিয়েছেন ঃ

''অতএব জগতের শিক্ষকদের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকলের উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরমধর্ম্ম।''[৪০]

শিক্ষার সঙ্গে ভক্তির যোগ আসলে প্রাচীন শিক্ষা ভাবনারই একটি রূপ। বঙ্কিমের এই ধরনের শিক্ষাচিন্তায় আধুনিকতার ছোঁয়া নেই।

বঙ্কিমের মতে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন।[৪১] এর কারণও তিনি ব্যক্ত করেছেন ঃ

''তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা,

তাঁহারাই কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকেরা অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নতি হইয়াছিল।''[৪২]

আসলে বঙ্কিম এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে, ব্রাহ্মণগুলি সেই সময় সর্বগুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁরা সমাজের শিক্ষক হয়েছিলেন। সেইসময় ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সর্বগুণের নির্ভরযোগ্য আধার। এখানে বঙ্কিম ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণদের গুণকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন। এর কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

''গুরু। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্তে যে শুদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।''[৪৩]

বঙ্কিমের শিক্ষা ভাবনায় একটা ভারসাম্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষাকে তিনি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। শিক্ষা গুরু হবেন তিনিই — যাঁর শিক্ষকসুলভ সব গুণ থাকবে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই।

বঙ্কিম 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দেশের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন ঃ

''..হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।''

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না — মেকলে প্রণীত ও হেস্টিংসের সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত।''[৪৪]

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় নির্বাচনেও বঙ্কিম গলদ দেখতে পেয়েছেন। যে বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় সেগুলি যথোপযুক্ত নয়। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে বিষয় নির্বাচনে গুরুত্ব দিয়ে বঙ্কিম সঠিক কাজই করেছেন।

বঙ্কিম পাশ্চাত্য শিক্ষার সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ

''আজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশ-বৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি।''[৪৫]

এমন শিক্ষা বঙ্কিম চেয়েছেন যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে 'লোকের উন্নতি হয়, সর্বসাধারণের উন্নতি হয়।' শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের এ চিন্তা সঠিক এবং সময়োচিত।

**■ লোকশিক্ষার ধারা ঃ**

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা ভাবনার একটা অংশ জুড়ে আছে লোকশিক্ষা। পূর্বে শিক্ষার এই ধারাটি অধিক সক্রিয় ছিল। এই শিক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে — গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র — বৌদ্ধধর্মের কূটতর্ক শাক্যসিংহের মাধ্যমে, শৈবধর্ম (শঙ্করাচার্যের মাধ্যমে), বৈষ্ণব ধর্ম (চৈতন্যদেবের মাধ্যমে), অনায়াসে শিখিয়েছেন। বঙ্কিমের বিশ্বাস, এই লোকশিক্ষার মাধ্যমেই বাংলায় ''ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি ঊনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ''[৪৬] লোকের শিক্ষা বিধান সম্ভব। বঙ্কিম বিশ্বাস করেন ঔপনিবেশিক শিক্ষা তথা 'বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া'[৪৭] সপ্তকোটি লোকের শিক্ষা বিধান করা যেতে পারে না। ঔপনিবেশিক শিক্ষার এই উপায়টিকে বঙ্কিম সঠিক বলে মনে করেননি। বঙ্কিমের মতে প্রকৃত শিক্ষা হল ঃ

''চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা।''[৪৮]

বঙ্কিম লোকশিক্ষার নানা মাধ্যমের কথা বলেছেন — যেমন, সংবাদপত্র, সভা, কথকতা এবং বক্তৃতা। বর্তমানে লোকশিক্ষার উক্ত মাধ্যমগুলি আজ আর ততটা সক্রিয় নয়। কিন্তু পূর্বে উক্ত মাধ্যমগুলি সক্রিয় ছিল। এই জন্য সেই সময় লোকশিক্ষা সফল হয়েছে। লোকশিক্ষা ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ হল — ক) অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকের দোষ, লোকশিক্ষাকে তাদের গুরুত্ব না দেওয়া। খ) শিক্ষিত অশিক্ষিত সমবেদনার অভাব। বঙ্কিমের আক্ষেপ এবং দুঃখ এখানেই ঃ

''ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে —
বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না! বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিতে বুঝেন না।''[৪৯]

বঙ্কিমের পরামর্শ ঃ

"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।"[২০]

বঙ্কিমের শিক্ষা ভাবনার ভিত্তি নির্মাণ হয়েছে Mass Education এর উপরে। ভারতবর্ষের সিংহভাগ জনসাধারণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে বলে বঙ্কিম মনে করেন — সেই শিক্ষাকেই তিনি সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ দিক থেকে তিনি একজন Humanist। এভাবেই বঙ্কিম শিক্ষাভাবনায় রেনেসাঁস ঘটিয়েছেন।

**তথ্য সূত্র ঃ**


১. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয়খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাদল কর্তৃক সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, পৃ.২৫৩।

২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম, বাঙ্গালার ইতিহাস, বঙ্কিম রচনাবলী, তদেব, পৃ.২৮৫

৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন, তদেব, পৃ.১৯৪

৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙালীর উৎপত্তি, তদেব, পৃ.৩১২

৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র, তদেব, পৃ.৫২৪

৬. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব, তদেব, পৃ.৬০৭

৭. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, তদেব, পৃ.৫৬১

৮. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, উপন্যাস সমগ্র, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, বিংশতিতম মুদ্রণ — শ্রাবণ ১৪১০, পৃ৯২

৯. দেনাড়ুগোপাল, অপ্রকাশিত বঙ্কিম প্রবন্ধ এবং নানা প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ.২১২-২১৩

১০. দেনাড়ুগোপাল, বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তায়, রেনেসাঁসের বিভিন্ন দিক, 'উনিশ শতকে বাংলা রেনেসাঁস ও বঙ্কিমচন্দ্র', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ বঙ্কিম জন্মজয়ন্তী, ২০১০, পৃ.২৩৯

১১. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৬৮২

১২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, দেবী চৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৭৫৪

১৩. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৫১

১৪. তদেব, পৃ. ৩৫১

১৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৭৪

১৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, তদেব, পৃ. ৫৫৬

১৭. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১১-১২

# চার ইয়ারি কথা ঃ এক চিরায়ত কথা

**ড. মলয়েন্দু দিন্দা**
**অধ্যাপক, ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব এডুকেশন**

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ -১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসেবেই সুপরিচিত। তবে শুধু প্রবন্ধেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবন্ধর পাশাপাশি তিনি কবিতা বিশেষ করে সনেট আর ছোটগল্পও লিখেছেন অনেক। অথচ কবি বা গল্পকার প্রথম চৌধুরীর কথা আমরা স্মরণে রাখি না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে প্রমথ চৌধুরী নিজেই জানিয়েছেন যে সাবালক হবার পূর্বেই তাঁর মনে সাহিত্যিক হবার সাধ জন্মে। কৈশোর থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন গল্পকার হবার। লেখক জীবন শুরুও করেছিলেন গল্প লেখা দিয়ে - অবশ্য মৌলিক গল্প নয়, অনুবাদ গল্প। কিন্তু সাহিত্যিক হবার সাধে অপ্রত্যাশিত বাধা পড়ল। প্রথম গল্প তিনি নিজে না লিখে ফরাসি গল্প থেকে একটি গল্প (Prosper Mcrime'e Etruscan Vase') অনুবাদ করেন ও সেটি *সাহিত্য* পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৯৮) 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। সে অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নি। তাঁর অনভিমত রবীন্দ্রনাথ *সাধনায়* প্রকাশ করেন এই বলে যে :

> ... প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাঙ্গলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়- ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্য হেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা মাধুর্য্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আক্রটুকু চলিয়া যায়। (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮)

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ হেন আক্রমণ প্রমথ চৌধুরীর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তারপর তিনি কার্মেন - অনুবাদে হাত লাগান কিন্তু শেষ করতে পারেন নি বলে প্রকাশও করেন নি। এর ফল হলো এই যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় 'আমার গল্প লেখার মনোরথ হৃদয়ে উত্থিত হতে না হতেই বিলীন হয়ে গেল, ভাষার দারিদ্র্যবশত'' (*বিয়োগপঞ্জি*, পৃ. ৫২)

এর সঙ্গে আরও যোগ করলেন :

এ অবস্থায় গল্প লেখার ইচ্ছা ত্যাগ করলুম। কিন্তু গল্প রচনার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে রয়েই গেল। ফলে মনে মনে গল্প রচনা করতে আমি বিরত ছিলুম না। তখন আমি সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় ছিলুম। সুতরাং মনে মনে খেয়াল দেখবার আমার কোন বাধাই ছিল না, অবসরের ত নয়ই। (ঐ পৃ. ৫২)

যৌবনের এই সময়েই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের। দু দিনের আলাপেই প্রমথ চৌধুরী বুঝতে পারলেন যে তাঁর মনগড়া কথা শোনবার একজন উপযুক্ত শ্রোতা হলেন নাটোরের মহারাজ। সে সময় তাঁরা উভয়েই বেশির ভাগ সময় গল্প করে কাটাতেন - আর সেই বাজে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে তিনি দু-চারটি স্বরচিত গল্পও জুড়ে দিতেন। মহারাজ নাটোর সেই সব গল্পের তারিফ করতেন। সেই ভরসাতেই পরে এরকম দু একটি গল্প প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'চার ইয়ারি কথা' হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি এবং এটিই হচ্ছে তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প। মহারাজ নাটোরের অকপট সহানুভূতি ও সখ্য না লাভ করলে তিনি হয়ত পরবর্তী কালে গল্প লিখতে প্রবৃত্ত হতেন না।

প্রথম চৌধুরীর গল্প লেখার পেছনে মহারাজ নাটোর ছাড়া আরও একজনের সংশয়াতীত অবদান ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথ। যে রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রমথ চৌধুরী একদিন গল্প লেখা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন পরে তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় আবার গল্প লেখায় হাত দেন প্রমথ চৌধুরী। এই পরিবর্তন ঘটে *সবুজ পত্র* প্রকাশের পরেই - অর্থাৎ *সবুজ পত্র*-র প্রথম যুগে, যে যুগকে রবীন্দ্রনাথ 'সম্পাদক ও একটি লেখকের লগি ঠেলার যুগ' বলেছেন। *সবুজ পত্র*-র পাতা ভরাট করতে প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও বেনামে মূলত প্রবন্ধই লিখতেন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন শুধু প্রবন্ধ লিখে লিখে তাঁর (প্রমথর) লেখার হাত নষ্ট হচ্ছে। তাই মাঝে মধ্যে লেখার হাত বদল করে নিলে ভাল হয়। অর্থাৎ প্রবন্ধ লেখার ফাঁকে ফাঁকে গল্প কবিতা ইত্যাদি

লেখার চেষ্টা করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের এ উপদেশ দেবার একটি বাস্তব তাগিদও ছিল। প্রথম যুগে *সবুজ পত্র*-র লেখক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। *সবুজ পত্র*-র লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথ ও সম্পাদক নিজে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> সবুজপত্রে কেবল মাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বলবে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে - তারপরে হয়ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে।

সেজন্য রবীন্দ্রনাথ প্রমথকে বলেন, ' তুমি একবার এ লাইনে [ছোটগল্প লেখা] চেষ্টা করে দেখ। যদি হাত খুলে যায় তাহলে কিছুদিন চলবে বেশ।' তারপরেই আর একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন যে মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] তাঁকে *সবুজ পত্র*র প্রতি সংখ্যায় একটা করে গল্প লেখার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। বিব্রত রবীন্দ্রনাথ প্রমথকে বলেন, 'তুমি এই ছুটিতে একটা গল্প লেখার চেষ্টা করো - কেবলি এক হাতের গল্প হওয়া ভাল নয়।' রবীন্দ্রনাথ যে ঐকান্তিকভাবে চাইছিলেন প্রমথ গল্প লেখায় হাত দিক - তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর একটি চিঠিতে। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> তুমি একবার কোমর বেঁধে গল্পে লাগলে আমি ত খুশি হই। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে - অবশ্য সম্পূর্ণ তোমার নিজের ধাঁচার একটা জিনিস হবে - অর্থাৎ ইস্পাতে গড়া মূর্তি হবে - ঝকঝক করবে অথচ কঠিন হবে - কড়া আগুনে গালাই করা ঢালাই করা জিনিস।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্রমাগত তাগাদায় ও উৎসাহে প্রমথ চৌধুরী গল্প লেখায় হাত দেন - যার ফলে আমরা পেলাম এক অনবদ্য গল্প - 'চার ইয়ারি কথা'। গল্পটি তিনি ১৩২২ এর ফাল্গুন মাসের মধ্যেই শেষ করেন। লোকমুখে খবর পেয়ে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> তোমার গল্পটি মেজে ঘষে বাগিয়ে রেখে দিয়ো। তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছো তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চলল।

প্রথম গল্প লেখার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও শুভানুধ্যায়ীদের মতামত শোনার জন্য প্রমথ চৌধুরী গল্পটি সবাইকে শুনিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাতে আপত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তাঁর মতে গল্পটি আচমকা বের করতে পারলেই ভালো হতো। রবীন্দ্রনাথ আরও চেয়েছিলেন যে *সবুজ পত্র*-র চৈত্র সংখ্যায় ( ১৩২২) 'চার ইয়ারি কথা'-র পুরোটাই প্রকাশ করা হোক। তা না করে প্রমথ চৌধুরী গল্পটি বের করেন তিন কিস্তিতে (চৈত্র ১৩২২, বৈশাখ, ১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)। *সবুজ পত্র*-য় প্রকাশিত হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত খসড়াটি পুরোটাই পড়েছিলেন। তাই প্রথম পর্ব *সবুজ পত্র*-য় প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন :

> ... এখন মনে হচ্ছে তোমার গল্পগুলো উল্টোদিক দিয়ে শুরু হলে ভাল হতো। তোমার গল্পটা (আমার কথা) সবচেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টানত — তারপর অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত।

*সবুজ পত্র*-য় 'চার ইয়ারি কথা' বেরবার পরই অনেকে গল্পটির সুখ্যাতি করেন। তখন লেখক নিজেই গল্পটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ১৯১৬-য় এবং ৯৭ পৃষ্ঠার এই ছোট বইটি উৎসর্গ করেন পত্নী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে। প্রথম প্রকাশের পরই বইটি অনেকের কাছে ক্লাসিক বলে গণ্য হয়। গল্পটি *প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী*-র (বসুমতী সংস্করণ) অন্তর্ভূত হয় ১৯৩০ এ; প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ-এ (বিশ্বভারতী সংস্করণ) গৃহীত হয় ১৯৪১-এ। আলাদা করে বিশ্বভারতী গল্পের বইটি প্রকাশ করে ১৯৫৩-য়। এটির পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৬৮ ও ১৯৯৫-এ। গল্পটির অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪-এ। প্রথম চৌধুরীর মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে। ইংরেজি তর্জমাটি করেন ইন্দিরা দেবী। 'চার ইয়ারি কথা'-র প্রতি লেখকের ও তাঁর সহধর্মিণীর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল - তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি চৌধুরী দম্পতি বইটি বিদেশ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর আমেরিকান পত্নী লীলা রায় এর (প্রকৃত নাম Alice Virginia Orndorf) সাহায্য চান। বিয়ের পরেই গুরুজনদের তলব পেয়ে লীলাদেবী যখন আমেরিকা যান তখন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ইংরেজী তর্জমাটি। বইখানা, অন্নদাশংকরের মতে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক। কিন্তু একই জিনিস যে ইংরেজ মার্কিনদের মন পাবে এমন কোনো কথা নেই। ওরা কেউ ছাপতে রাজি হয় না। অন্নদাশঙ্কর সে কথা লিখে প্রমথ চৌধুরীকে জানান এবং বলেন যে অনুবাদটি সেকালের ইংরেজি, তাকে একালের ইংরাজি করতে হলে আর কাউকে দিয়ে মাজাঘষা করা দরকার। তিনি নাম করেন তাঁর বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্য-র, যাঁকে প্রমথ চৌধুরী নিজেও চিনতেন। এ কথায় প্রথম চৌধুরী রাজি হন না, তাঁর ধারণা ইন্দিরা দেবীর ইংরেজিতে

কেউ হাত দিতে পারে না। ফলে তর্জমাটি অন্য কাউকে দিয়ে মাজাঘষা না করেই ফেলে রাখা হয়। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর ১৯৪৪ এ পুলিনবিহারী সেন এর উদ্যোগে বিশ্বভারতী থেকে বেরয়, 'চার ইয়ারি কথা'-র ইংরেজী তর্জমা, Tales of Four Friends' নামে। এটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই Times Literary Supplement (June 1944) - 'এ বইটির একটি সমালোচনা বেরয়, যাতে বলা হয় :

> *Tales of Four Friends* is an Indian attempt to write the counterpart of such tales as Mr. Kipling's *Without Benefit of Clergy* and Pierre Loti's *Romantic accounts of exotic armours*. We need only add that Mr. Chaudhuri's style is worthy of the high reputation his magazine has won as a record of all that is best in contemporary Bengali literature..

বিলেত থেকে ফিরে আসার (১৮৯৬) বছর দশেক পরে (১৯১৬) 'চার ইয়ারি কথা' লেখেন প্রমথ চৌধুরী। গল্পের বইটি পড়ে সে সময় অনেকের চটক লাগে - বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের। সমালোচকদের কাছেও গল্পটি 'নতুন' বলে বিবেচিত হয়। দু চার জন সমালোচক অবশ্য বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এই বলে যে গল্পগুলি ফরাসি থেকে ধার করা, কেউ বা বলেন ওগুলি আনাতোল ফ্রান্সের গল্প থেকে চুরি করা। প্রমথ চৌধুরী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন যে, যাঁরা ফরাসির কথা বলছেন তাঁরা ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, আনাতোল ফ্রান্সের কথা যাঁরা বলছেন, আনতোল ফ্রান্সের গল্পের সঙ্গে যদি তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় থাকত, তাহলে তাঁরা গল্প লেখককে চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতেন না। প্রমথ চৌধুরীর মতে গল্পটির পুরোটাই তাঁর স্বকপোলকল্পিত। এর সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর একটি পূর্বস্মৃতিতে, এটি অনেকেরই অজানা। তাই এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি :

> আমি একদিন রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময়ে মহারাজ আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম 'হঠাৎ এত রাত্তিরে আগমনের কারণ কি? তিনি উত্তর করলেন 'চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটেছে তাই শুতে যেতে ইচ্ছে করছে না, চল দুজনে বেড়িয়ে আসি।' কোথায় বেড়াতে যাওয়া যাবে?' উত্তর এল 'পথে পথে, তারপর গড়ের মাঠে, যেখানে অবাধ জ্যোৎস্নার ভিতর ঘুরে বেড়াতে পারব।' আমি উত্তর করলুম, 'আপনার দেখছি জ্যোৎস্নার নেশা ধরেছে। তিনি বললেন - 'ধরবে না? দেখছ না চাঁদের আলো শ্যাম্পেনের ফেনার মত চাঁদের পেয়ালা থেকে আকাশময় ঝরে পড়ছে।' এই উপমা শুনে আমি হেসে উঠলুম ও বল্লুম, 'চলুন যাই, বিনে পয়সায় প্রাণভরে প্রকৃতির শ্যাম্পেন পান করে আসা যাক,' এই কথোপকথনের পর আমি, মহারাজ ও তাঁর গোপাল নামক আমাদের সমবয়সী একটি আমলা - আমরা তিনজনে পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেরালুম। যেতে যেতে শেষটা লাল রাস্তায় গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন একটা বেজে গিয়েছে, সে রাত্তিরে সত্যই অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছিল। সে জ্যোৎস্নার বর্ণনা আমি 'চার ইয়ারী কথা'র প্রথম কথায় লিপিবদ্ধ করেছি। হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল এল। সে খেয়ালটি আমি গল্পচ্ছলে আমার সঙ্গী দুটিকে শোনালুম। তাঁরা নীরবে আদ্যোপান্ত গল্পটি শুনে গেলেন, আর দুজনেরই বিশ্বাস হল যে আমি যে ঘটনার কথা বলছি সেটি একটি সত্য ঘটনা। গল্পটি যখন শেষ হল তখন গীর্জের ঘণ্টায় দুটো বাজল, আমরাও বাড়ীমুখে ফিরলুম।

সে গল্পটি হচ্ছে - 'চার ইয়ারী কথা'র প্রথম গল্প।

এই স্মৃতিলিপি থেকে বলা যায় যে গল্পটি আগাগোড়া তাঁর নিজের রচনা - কোনো বিদেশী গল্পের ছায়া বা ভাব অবলম্বনে রচিত নয়। বরং সে সময় অনেকেই প্রমথ চৌধুরীকে মুখে বলেছেন, তাঁর নায়িকাগুলির বর্ণনা, কথোপকথন ও চরিত্রায়ণ এত নিঁখুত যে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে 'চার ইয়ারি কথা'র চারটি নায়িকার সঙ্গে বিলেতে তাঁর নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন লেখা সম্ভব নয়। প্রত্যুত্তরে প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'প্রথম নায়িকা হচ্ছে পাগল, দ্বিতীয়টি চোর, তৃতীয়টি জুয়াচোর, আর চতুর্থটি ভূত। বলা বাহুল্য, একরকম চারটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের নায়িকার একটির পর একটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। এই চারটিই আমার মনগড়া। তবে এর ভিতর তৃতীয় গল্পের নায়িকার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, যাকে আমি রিণী নামে গড়ে তুলেছি।'

সেকালে পাঠক সমাজের বিশেষ উৎসাহ ছিল তৃতীয় গল্পের রহস্যময়ী নায়িকা রিণীকে নিয়ে। বিশেষত রিণীর সঙ্গে লেখকের কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা তাই নিয়ে। আত্মকথায় এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী যা লিখেছিলেন তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। আর যে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বা *বৈশাখীতে* (১৩৫২) প্রকাশিত হয়েছে উৎসাহী পাঠকরা ঐ লেখাটি অনুগ্রহ করে পড়লে চার ইয়ারি কথার রহস্যময়ী নায়িকা রিণীর আসল নাম ও পরিচয় জানতে পারবেন। এখানে খুব সংক্ষেপে রিণীর পরিচয় তুলে ধরা হলো। প্রমথ চৌধুরীর জবানিতেই শুনুন - আমি এমন একটি যুবতীকে জানতুম, যাকে রিণীর রূপ দেওয়া

যায়। তার যথার্থ নাম ছিল কাতি, - ইংরেজী Katieর ফরাসী উচ্চারণ। সে আধা-ফরাসী আধা ইংরেজ। .. সে অল্প বয়সে ব্রাসেলসে থাকত, সেখানকার Conservatoireএ, ভাল করে গানবাজনা শেখবার জন্য। সে ছিল অভিজাতবংশীয়া। কাতি ছিল অতিশয় সুন্দরী এবং অতিশয় চালাক চতুর। কাতির মুখ ছিল লম্বা ধরণের, নাক লম্বা, চোখও লম্বার দিকে বড় এবং সমস্ত মুখচোখে একটা তীক্ষ্ণভাব ছিল। ... আমি এই একটি সত্যিকারের মেয়েকে ভেঙ্গে ''চার ইয়ারী কথার'' চারটি নায়িকাকে তৈরী করেছি। ....দ্বিতীয় গল্পের নায়িকাকে আমি বইয়ের দোকানে প্রথম দেখি, কাতিকেও তাই। তারপর যা সব লিখেছি, সে সব হচ্ছে সীতেশকে ফোটাবার জন্যে। যখন 'চারই য়ারী কথা' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাকে বহুলোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, এ গল্পটি real কিনা। উত্তরে আমি বলি, তাহলে গল্পটি উতরেছে। কেননা, যা আগাগোড়া কল্পনার জিনিস, অনেক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়েছে। কাতির সঙ্গে আমি ভালবাসায় পড়ি আর না পড়ি, সেকালে যুবক পাঠকের দল অনেকে রিণীর প্রেমে পড়েছিল। বাস্তবে রিণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কি না সে প্রশ্নের কোনো সোজা সাপটা উত্তর না দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেন : বিলেতে গিয়ে, আর সেখানে ৩/৪ বৎসর আমি যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিনি এবং তাদের সংশ্রবে আসিনি, এ কথা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না। বিশেষত আমি যখন বিলিতি নায়িকার বিষয় গল্প লিখেছি, আর তার একটি গল্পে সত্য ঘটনার ছাপ আছে। গল্প লেখককে তার কল্পিত নায়িকার নায়ক বলে ভুল করা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সহজ। এ হচ্ছে সাহিত্যিকদের কপালের লেখা। আমি একজন সাহিত্যিক, এবং এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে গণ্য ও মান্য সাহিত্যিক। কি করে আমি সাহিত্যিক হলুম, সে কথা পরে বলব। মোট কথা হচ্ছে এই যে, বিলেত থেকে মেম ঘাড়ে করে দেশে ফিরিনি।

... ঠিক কথা। প্রমথ চৌধুরী বিলেত থেকে মেম ঘাড়ে করে নিয়ে আসেন নি। তবে কাতির সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কাতির আসল নাম ছিল কেটি কার্পেন্টার। ইন্দিরা দেবীর একটি চিঠির উত্তরে ১৮৯৬ এর অক্টোবর মাসে ভাগলপুর থেকে একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী লেখেন : কেটি কারপেন্টার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি ছিল-সে ভালবাসা না fascination, ভণ্ডামি না আত্মপ্রেরণা সে কথা আর এখন বিশ্লেষণের দ্বারা পরিষ্কার রকম বুঝে নেবার কি দরকার। মড়া কেটে দেখা জিনিষটের ওপর আমার প্রবৃত্তি নেই। তবে সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলতে পারি, ব্যাপারটা খেয়ালের ওপর আরম্ভ হয়েছিল সময় কাটাবার জন্য ইংরেজিতে যাকে বলে pastime - ক্রমে খেলাটা জুয়াখেলায় পরিণত হয়েছিল। আর বেশি বলবার দরকার নেই - ও জুয়াখেলা শব্দটাতেই কি সমস্ত বোঝা যাচ্ছে না! তবে মানবহৃদয় নিয়ে খেলা আমরা কেউই সহজে খেলতে পারিনে।

*চার ইয়ারি কথা* বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল দিকচিহ্ন। বিশেষ করে ন্যারেটলজি চর্চার ক্ষেত্রে। ফর্ম বা আঙ্গিকের বিচারে এটি 'একের ভেতর দুই' বা 'গল্পের ভেতর গল্প'-র একটি বিশেষ রূপ। গল্পের গোড়ায় আছে একটি 'কাঠামো গল্প' বা 'ফ্রেম গল্প', আর তার ভেতরে আছে 'মূল গল্প' আবার ভেতরের গল্পের মধ্যে আছে চার চারটি আলাদা আলাদা কাহিনী। অবশ্য এই আলাদা চারটি কাহিনীর মধ্যে একটি ভাবগত যোগ অবশ্যই আছে। গল্পের শেষে আবার ফিরে আসে কাঠামো গল্পটি। ফ্রেম গল্পে আছে মোট চারটি চরিত্র - সেন, সীতেশ, সোমনাথ ও ফ্রেম গল্পর কথক / লেখক (রায়) নিজে। কাঠামো গল্পটি আমি /আমরা-র বয়ানে লেখা। কাঠামো গল্পটি এসেছে মূল গল্পটির প্রেক্ষিত রচনার জন্য। কাঠামো গল্পে দেখা যায়, ক্লাবের সান্ধ্য আসরে তাস খেলতে এসে চার বন্ধু বাড়ি ফেরার মুখে আটকে পড়ে আকাশের বেগতিক অবস্থার জন্য। আলো-আঁধারিতে ভরা ও আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত রাতে চার ইয়ারির মনে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। আকাশ জোড়া মলিন ও মরা আলো তাদের স্তম্ভিত করে দেয়। সেই রাতের সেই মেঘ চোয়ানো আলোর ভিতর যে অপরূপ সৌন্দর্য ছিল তার দিকে চেয়ে সকলেই এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে চার ইয়ারিরা একে একে তাঁদের মনের মধ্যে জমে থাকা গুপ্ত সুপ্ত প্রণয় কাহিনী বলতে শুরু করেন। এই অংশে প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন : যেন ঐ রাতের চাঁদের 'দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো' তাঁদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের অন্তরের গোপন কথা যেন টেনে বের করে আনছে। ফলে চার বন্ধু তাঁদের গোপন প্রণয় কাহিনী বলতে শুরু করেন। এখান থেকে শুরু হয় মূল গল্প।

মূল গল্পের ভেতরে প্রথমে আসে সেন এর কথা, ফ্রেম গল্পে বর্ণিত দুষ্ট ক্লিষ্ট আলোর বিপরীতে এখানে পাওয়া যায় এক পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্নার বর্ণনা - যার আলোর মায়াতে 'পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা

মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল'। তখন সদ্য এম এ পাশ করা যুবক সেনের সংসারে কোনো দায় দায়িত্ব ছিল না, কোনো নারীর প্রতি প্রণয়াসক্তিও ছিল না, তবু তাঁর মনে কোনো সোয়াস্তি ছিল না, সুখ ছিল না - ছিল শুধু এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা যা তাঁর মনে একটি কাল্পনিক, একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভাবতেন যে জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই তিনি সজীব হয়ে উঠবেন। এমন মানসিক অবস্থায় এক জ্যোস্নালোকিত রাতে সেন গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে যেন সাক্ষাৎ পেলেন তাঁর eternal feminine-এর, তাঁর চিরাকাঙ্ক্ষিত 'চিরন্তনী নারী'র। সেই নারী যেন সশরীরে দূরে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে। ঐ কুহকী রাতে চন্দ্রাহত সেন যখন এই নব উচ্ছসিত প্রণয়বেদনা অনুভব করছিলেন, শিহরিত হচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ সেই 'চিরন্তনী নারী'র অস্বাভাবিক বিকট চিৎকারে, তার সেই মর্মভেদী অট্টহাসিতে সেন বুঝতে পারেন যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারীটি আসলে পাগল একেবারে উন্মাদ, পাগলা গারদ থেকে কোনো সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই হলো সেনের প্রথম ভালোবাসা ও শেষ ভালোবাসা। এই অভিজ্ঞতার তীব্র অভিঘাত সেনের মনকে চিরদিনের জন্য প্রণয় মোহ হতে মুক্ত করেছিল।

দ্বিতীয় কাহিনীটি সীতেশের, তাঁর প্রকৃতি সেনের ঠিক বিপরীত। স্ত্রী জাতির প্রতি মন তাঁর স্বভাবতই নরম। ঐ জাতির দেহ ও মনে যে বিশেষ শক্তি আছে তা তাঁর দেহ মনকে নিত্য টানত। সেন যেমন একটি নারীর মধ্যে তাঁর eternal feminine-কে পেতে চেয়েছিলেন, সীতেশ তেমনি তা পেতে চেয়েছিলেন অনেকের ভেতর। ফলে তাঁর মনে ঐ নারীদের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে - কেবল একটি স্ত্রীলোকের স্মৃতি ছাড়া। একদিনের একটি ঘটনা সীতেশ কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। লন্ডনের নিরানন্দময় স্যাঁতসেঁতে বর্ষায় বিরক্ত হয়ে সীতেশ আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন সস্তা উপন্যাসে বর্ণিত অভিজাতবর্গের তরল প্রণয় কাহিনীর মধ্যে। রোমান্টিক উপন্যাসে তা না পেয়ে সীতেশ বেরিয়ে পড়লেন লন্ডনের রাস্তায়। নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ঢুকে পড়লেন একটি পুরনো বই-এর দোকানে। সেখানেই সীতেশ যেন খুঁজে পেলেন তাঁর 'চিরন্তনী নারী' টিকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড় পরা স্ত্রীলোকটির পাচুলির গন্ধ আর তার হাসি ও চোখের আলো সীতেশকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। প্রণয়াসক্ত হয়ে সীতেশ ভেবেছিলেন স্ত্রীলোকটি তাঁর জীবনে 'আলো' হয়ে এসেছে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় 'আলো' না হয়ে 'আলেয়া' হয়ে স্ত্রীলোকটি অন্তর্ধান করে। যাবার আগে চুরি করে নিয়ে যায় সীতেশের পকেটের গিনি ক'টি, আর কার্ডে লিখে রেখে যায় এক অমোঘ সত্য 'পুরুষ মানুষের ভালোবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক।'

তৃতীয় গল্পের কথক সোমনাথ। তিনি মেধাবী দার্শনিক, রূপযৌবনপূর্ণ পুরুষ কিন্তু প্রণয়বিদ্বেষী। বা সত্ত্বেও সোমনাথ তাঁর জীবনের চিরন্তনী নারীকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। বিলাতের Ilfracombe এ দেখা পান তাঁর চিরাকাঙ্ক্ষিতা নায়িকা রিণী-র। রিণীর মধ্যেই পেয়েছিলেন তাঁর eternal feminine-কে, রিণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও প্রেম যেমন আকস্মিক, তার পরিণতিও তেমনি চমকপ্রদ। প্রথম আলাপে তাদের মধ্যে যে ভালোবাসার সঞ্চার হলো তাতে হয়তো লঘুচিত্ততার পরিচয় ছিল। কিন্তু এক বছর ধরে সম্পর্কটি এগিয়ে চলায় শেষের দিকে ভালোবাসার গভীরতারও পরিচয় পাওয়া যায় - অন্তত সোমনাথের দিক থেকে। রিণীর কৃতিত্ব এই যে সে নিজে ধরা না দিয়ে দার্শনিক সোমনাথের চির অনাসক্ত মনকে প্রণয় বাসনার পাশে বাঁধতে পেরেছিল। অবশেষে একদিন অভাবনীয়ভাবে এই প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটে। রিণীর পত্র প্রমাণ করল যে সে সোমনাথকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জর্জ-এর প্রণয়াবেগকে তীব্রতর করার জন্য ব্যবহার করেছিল। এটি প্রেম ছিল না, ছিল প্রেমের অভিনয়। জর্জ-এর রিণীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেবার সঙ্গে সঙ্গে রিণীর কাছে সোমনাথের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এই প্রতারণার পরে রিণী নিজেও প্রতারিত হলো। বিবাহের বছরখানেক পরেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। স্পেনের একটি কনভেন্টে চিরজীবনের মতো আশ্রয় হলো রিণীর।

চতুর্থ গল্পটির কথক লেখক নিজে - বন্ধু মহলে যিনি 'রায়' নামে পরিচিত। এই গল্পের মূল বিষয় হলো 'আনি' নামে এক বিলিতি দাসীর গোপন প্রেমকাহিনী। ভারতীয় প্রেমিক রায় এর সঙ্গে মিলনের জন্য তার আজীবন সাধনা। রায়-এর বাসা বদলের ফলে, ও পরে দেশে ফিরে আসায় আনির প্রেম পরিণতি লাভ করে নি। জীবনের পথে ঘা খেতে খেতে সে নার্সের জীবিকা বেছে নেয় যাতে ভবিষ্যতে ভারতে গিয়ে সে রায়কে খুঁজে পেতে পারে। এরপর সে এবং তার চিকিৎসক স্বামী দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। তারপরেই আসে আনির পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টেলিফোনে পরলোকবাসিনী 'আনি'

তার চিরকাঙ্ক্ষিত পুরুষটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। লক্ষণীয় যে এই চতুর্থ গল্পটিতেই কেবলমাত্র একটি অলৌকিক মাত্রা যোগ হয়েছে। রায়-এর কাঙ্ক্ষিত নায়িকা কোনো রক্ত মাংসের নারী নয়। সে এক প্রেতাত্মা। চারটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেম যখন নিবিড় ও আবেশবিহ্বল হয়ে আসছে তখনই অপ্রত্যাশিত ভাবে নেমে আসে গল্পের anti-climax, প্রণয়নেশার রোমান্টিকতাকে উড়িয়ে দিয়ে নায়করা নেমে আসেন বাস্তবের মাটিতে। যে চারটি গল্প বলা হয় তার সবকটিই যেন এই কথাই প্রমাণ করে যে, love is both a mystery and joke। এভাবে ভেতরের গল্পে আমরা পাই চারটি উপাখ্যান কিন্তু চারটির ফোকাস, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় Pointing finger, একই। উপাখ্যানগুলির ফোকাস হলো গল্প কথকদের 'চিরন্তনী নারী'কে সন্ধান করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা। পুরো গল্পটির মধ্যে এই ফোকাসটি কখনও সরে যায় নি বলেই এটি একটি সার্থক ছোটগল্প হয়েছে, নইলে হতো এটি হতো চারটি ভিন্ন ভিন্ন গল্প বা আখ্যান। গল্পের শেষে আবার ফিরে আসে কাঠামো গল্পটি। তাতে দেখা যায় রায়-এর গল্প শেষে গির্জের ঘণ্টায় রাত বারোটা বাজল। চার ইয়ারির অভিভূত অবস্থা কেটে গেল, বাস্তবে ফিরে এলেন তাঁরা, ঘরে ফেরার জন্য চাকরদের গাড়ি জুড়তে বললেন। অবশেষে তাঁরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

*চার ইয়ারি কথা*-র আঙ্গিকের আলোচনায় আরও দু একটি কথা বলা দরকার। যেমন কাহিনীর কথকরা সকলেই 'আস্থার যোগ্য কথক' কেননা তাঁরা সকলেই তাঁদের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলছেন এবং আমি-র বয়ানে বলা তাঁদের গল্পগুলি তাই শ্রোতার কাছে তথা পাঠকের কাছে সত্য বলে মনে হয়, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। তা বলে তাঁদের শ্রোতারা কিন্তু কেউ 'সরল বিশ্বাসী' বা naive নয়। গল্প শুনে তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, সংশয় জাগে। সত্য মিথ্যা তাঁরা যাচাই করতে চান। গল্পের পরিণতিতে খুশি না হয়ে তাঁরা বার বার বাধা দিতে পারেন। গল্পের অসঙ্গতি তুলে ধরে গল্পের পরিণতিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, বিলম্বিত করতে পারেন - ঠিক যেমনটি ঘটে সোমনাথের বেলায়। আর একটি বিষয় লক্ষ করার আছে। তা হলো গল্পটিতে দুটি 'সময়' বা narative time আছে। বাইরের কাঠামো গল্পটি রাখা হয়েছে বর্তমান-এ, মূল কাহিনী চারটি রাখা হয়েছে দূর অতীতে। ফলে গল্পের মধ্যে দুটি সময় কাঠামো দেখা যায় - ফ্রেম গল্প বলার সময় ও মূল কাহিনী বলার সময়। এই দুই সময়ের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর। এই দুই ধরনের সময় ব্যবহার করে লেখক যেন বোঝাতে চান ফ্রেম গল্পটি তিনি লিখেছেন আর মূল গল্পটি তিনি শুনেছেন।

*চার ইয়ারি কথা*-র আঙ্গিকটি কোনো ইংরেজি বা ফরাসি ছোটগল্প বা উপন্যাস থেকে ধার করা নয়। বরং এর পেছনে আছে উর্দু বা আরও সঠিক ভাবে ফারসি সাহিত্যর ঐতিহ্য। ফারসিতে এক ধরনের কাহিনী পাওয়া যায় যাতে বাস্তবের সঙ্গে নানা উদ্ভট ও অলৌকিক ব্যাপার মিশে থাকে। ফার্সিতে এ ধরনের কাহিনীকে বলা হয় অফসানা, আজগুবি (অফসানা বলতে বোঝায় মায়াবী বা জাদুকর) এই অফসানার একটি বিশেষ ধারা হলো 'চাহার দরবেশ' নামে এক ধরনের গল্প সংকলন (প্রমথ চৌধুরী 'চাহার দরবেশ' নামেও একটি ছোটগল্প লিখেছেন, সেটিও আমাদের সকলের পড়া উচিত) এতে একের ভেতর অনেকগুলি অন্য গল্প ঢুকে পড়ে তবে সেগুলি বিচ্ছিন্ন নয়। গল্পগুলি আলাদা হলেও সেগুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ভাবগত মিল থাকে। শেষে ফ্রেম গল্পটি আবার ফিরে আসে। অলৌকিক উপায়ে সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হয়। প্রমথ চৌধুরী *চার ইয়ারি কথা-য়* 'চাহার দরবেশ' এর ঐতিহ্যটিকে ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি ফ্রেম গল্পের ভেতরে যে মূল গল্প তার কাহিনীকে চার এ বেঁধে রাখেন, ভেতরের গল্পে আর অন্য কোনো কাহিনী আসে না। এই চারটি গল্পের মধ্যে একটি ভাবগত যোগও বজায় থাকে। *চার ইয়ারি কথা-য়* যেমন চারটি নায়কই তাঁদের 'চিরন্তনী নারী'কে খুঁজতে গিয়ে ধোঁকা খেয়েছেন। ফার্সি ঐতিহ্যের সঙ্গে শুধু তফাৎ হলো যে ফার্সিতে ভেতরের গল্পগুলি অলৌকিক কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে সেগুলি বেশির ভাগই লৌকিক (কেবলমাত্র চতুর্থ গল্পটি খানিক অলৌকিক) আর অলৌকিকভাবে কারুরই ইচ্ছাপূরণ হয় না। ফলে *চার ইয়ারি কথা*-র রোমান্টিক আবহ-র মধ্যে একটি অ্যান্টি-রোমান্টিক মাত্রা যোগ হয়েছে। এটিই হচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বিশেষত্ব।

আমাদের বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর যারা বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'চার ইয়ারী কথা' প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠগুলির মধ্যে একটি। গল্পের গঠনের যে কৌশল, কল্পনার যে চমৎকারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টির যে সূক্ষ্মতা এবং প্রকাশের যে অভিনব ভঙ্গি 'চার ইয়ারি কথা'য় পাওয়া যায়, শুধু আমাদের নয় যে কোনো দেশের সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতও তাই । তাঁর ধারণা *চার ইয়ারি কথা* বাংলা সাহিত্যের একটি

চিরায়ত সম্পদ। অন্নদাশঙ্করের ভাষায় : 'চার ইয়ারী' থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্য নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্য নয়, চিত্তের রসের জন্য নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চার ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হয়েছে ওতে।

প্রমথ চৌধুরী নিজেও সম্ভবত সচেতন ছিলেন তাঁর এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে। তাই এ ধরনের গল্প দ্বিতীয় বার লেখার চেষ্টা তিনি করেন নি।

**রচনাপঞ্জি ঃ**

(আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে প্রকাশস্থান কলকাতা বুঝতে হবে)


অন্নদাশঙ্কর রায়। *দেখা শোনা*। মিত্র ও ঘোষ পাব.প্রা.লি., ১৩৯৫। *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯।

প্রমথ চৌধুরী। *গল্পসংগ্রহ*। বিশ্বভারতী, ১৯৭৪।

_____ *আত্মকথা*। মনফকিরা, ২০১০।

_____ *রবীন্দ্রনাথ*। মলয়েন্দু দিন্দা সম্পা.। মনফকিরা, ২০১০।

_____ *বিয়োগপঞ্জি*। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও মলয়েন্দু দিন্দা সম্পা.। সহজ পাঠ, ২০১৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *চিঠিপত্র*, পঞ্চম খণ্ড। বিশ্বভারতী ১৪০০।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ন্যারেটলজি : ছোটগল্প : ছোটোদের গল্প। *কোরক*, ২০১৪।

সুভাষ চৌধুরী *সম্পা.* *ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ২০০৬।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৩৬৯।

Mukhopadhyay. Arun Kumar. *Pramatha Chaudhuri*. Sahitya Adademi. 2002 (1st pub. 1970).

# আদি পর্বে বাংলা সঙ্গীত

**ড. পার্থ প্রতিম দে**
**শিক্ষক, সোদপুর দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ (বালক)**

মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই সম্ভবত ধরণীর শ্রেষ্ঠতম জীবের জীবন স্পন্দিত হয়েছে সুরে-তালে-ছন্দে। আর তখন থেকেই আবির্ভাব সঙ্গীতের। ধ্বনি বা নাদ থেকে সৃষ্টি স্বরের, স্বর থেকে উদ্ভুত সুর। ব্রহ্মাণ্ডের এক অনবদ্য ছন্দে লীলায়িত সৃষ্টিশীল মানবমন সুরে নিবদ্ধ বাণীকে সঙ্গীতের যে মোহনীয় অবয়বে পরিণত করেছে, তার বিচিত্র রূপ প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে আজ বিশ্বের এক বিপুল সম্পদ। ভুবনায়িত সুরের সাম্রাজ্যে ভারতীয় তথা বাংলা সঙ্গীতের অবস্থানটিও নিঃসন্দেহে গৌরবোজ্জ্বল। বাঙালি মনন চিরদিন সৃষ্টিশীল নান্দনিকতায় জারিত। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য আদি শিল্পের বহুধা-বিভক্ত পথে তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা। বিশেষত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালির আকর্ষণ এবং সৃষ্টির প্রণোদনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ পরিচয়টি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন বাংলা সাহিত্যের পথ চলা শুরু, তেমনি বাংলা সঙ্গীতের ধারাটিও প্রায় সম-সময়েই পুষ্ট হতে শুরু করে। যাপিত জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ততায় ক্লান্ত মানব হৃদয় সুরের প্রবাহে অবগাহন করে খুঁজে নিতে চেয়েছে শান্তি ও স্বস্তি। ক্লেদাক্ত সংগ্রামে অবসন্ন বাঙালি, সঙ্গীতের স্পর্শে নিজেকে করে নিতে চেয়েছে উজ্জীবিত। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারা থেকে রসদ সংগ্রহ করেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বাংলা সঙ্গীতের ভুবন।

সপ্ত-স্বরের ধ্রুপদী কাঠামোয় ভারতীয় সঙ্গীতের চলনটি আবদ্ধ হলেও স্থান ভেদে ক্রমশ তার বিশিষ্ট স্থানীয় রূপগুলিও তৈরি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী আঙ্গিক তাই আজ অনেকটাই পৃথক। আবার ভারতীয় ভু-খণ্ডের পূর্ব প্রান্ত একসময় অনেকখানি প্রান্তিক হয়ে থাকায় তার সংস্কৃতিতেও রয়েছে কিছু ভিন্নতার অভিজ্ঞান। ভাষা সাহিত্য সঙ্গীত সবই সংস্কৃতির অঙ্গ। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব প্রান্তের তথা বাংলার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে যে সাঙ্গীতিক বোধের উদ্ভব তা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ। বাংলার সাঙ্গীতিক ভাবনা ও নিজস্ব চলনের উদ্ভবের সময়কাল নির্দিষ্ট ভাবে আজ বলা কিছুটা কঠিন। কারণ ভাষার মত সঙ্গীতও কোনো স্থির জড়বস্তু নয়। পরিবর্তন - পরিমার্জন- পরিবর্ধনের এক অন্তহীন প্রক্রিয়া ভাষা ও সঙ্গীতকে সজীব রাখে। তবু একথা বলা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে , বাংলা ভাষা উদ্ভবের সমসাময়িক কাল থেকেই যেমন বাংলা সাহিত্যের পদধ্বনি শোনা যায়, তেমনি বাংলা সঙ্গীতের পথ চলারও সূচনা। তাই তো দেখি বাংলা সাহিত্যের আদিতম রচনা চর্যাগুলি একদিকে যেমন কবিতা, অন্যদিকে তেমনি গান। চর্যাপদের কবিরা নিজস্ব ধর্ম সাধনার গুঢ় তত্ত্বকে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও লোক জীবনের বাহ্যিক বর্মে আবৃত করে পরিবেশন করার সময় সুর তালের সাহায্য নিয়েছেন। তাই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে গান। আরও স্পষ্ট করে বললে, মূলত ধর্মীয় সাধন সঙ্গীত। সেকালে সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিধি নিষেধ জারি থাকায় অদীক্ষিত ব্যক্তির কাছে গোপন রাখার অভিপ্রায়ে পদকর্তাগণ রূপক চিত্র ও সাঙ্কেতিক ভাষার মাধ্যমে সেগুলিকে গীতিরূপ দান করেছিলেন। অষ্টম শতক থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি রচনার প্রথা সহজিয়া বৌদ্ধ সাধক কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রচুর গান রচনা করতে। চর্যা সাহিত্যের আঙ্গিক তাই প্রকৃত অর্থে সঙ্গীতের। অবশ্যই বাংলা ভাষার সেই আদি পর্বে। এই গানগুলিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি মিশে রয়েছে হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমিয়া, মগহি ভাষার অনেক শব্দ। কিন্তু শেষ বিচারে চর্যাগান বাংলা সংস্কৃতিরই অঙ্গ। অর্থাৎ বাংলা সঙ্গীতের সূচনা পর্বের উদাহরণ হিসাবে চর্যাগীতির উল্লেখ তথ্যগত ভাবে সঠিক।

ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টিলগ্ন ঋগ্বেদের যুগের সমীপবর্তী। সংহিতা অংশগুলি সুরে-ছন্দে পঠিত হতো এবং শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করতো। বিশেষত সামগানের লীলায়িত ছন্দে মুখরিত হয়েছে একদা প্রাচীন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ধ্রুপদ সঙ্গীত সেই

আদি যুগের প্রধান ধারা। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে ধ্রুপদ সঙ্গীতের পাশাপাশি খেয়াল এবং ভজন ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করেছে। সংস্কৃত সামগান, তারপর পালি-প্রাকৃতের অপভ্রংশ অবহট্ট সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য থেকে ধীরে ধীরে সৃজিত হয়েছে বাংলা সহ উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন নব্য ভাষার সঙ্গীত জগৎ। রাগ সঙ্গীতের মূল ধারাটি হিন্দি বাণী আশ্রিত হয়ে উঠলেও, নব উদ্ভুত বাংলা ভাষাতেও গান রচিত হতে শুরু করে। এই ধারাতেই চর্যাগীতির আবির্ভাব। তবে চর্যাগুলিকে পদ বলেও অভিহিত করা হয়েছে। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথিটি প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন - 'গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মত, গানের নাম চর্যাপদ।' (মুখবন্ধ, বৌদ্ধগান ও দোঁহা)। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কীর্তনকে পদ নামে অভিহিত করার যে ঐতিহ্য আছে, সম্ভবত সেটিকে অনুসরণ করেই শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাগুলিকে পদ নামে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে এই গানগুলিকে ঠিক কীর্তন বলা যায় কিনা, তা নিয়ে সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে সংশয় আছে (ডঃ রাজেশ্বর মিত্র, বাংলার সঙ্গীত)। যাই হোক চর্যাগুলির গেয় প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাবনা, আকার সংক্ষেপ ইত্যাদি লক্ষ্য করেই সম্ভবত শাস্ত্রী মহাশয় এগুলিকে বৈষ্ণব পদের সমগোত্রীয় পদ মনে করেছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে অবশ্য পূর্ণাঙ্গ গীত অর্থে 'পদ' শব্দের ব্যবহার আছে। প্রকৃত পক্ষে এক একটি চর্যা কতগুলি 'পদ' বা চরণ যুগ্মকের সমন্বয়ে গঠিত। 'মানসোল্লাস', 'সঙ্গীত রত্নাকর' ইত্যাদি সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, দশম শতাব্দী বা তারও কিছু আগে থেকে 'চর্যা' নামের এক ধরনের আধ্যাত্মিক সঙ্গীত পূর্ব ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ক্রমে সেই গান দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত হয়। সঙ্গীতিক কাঠামোর দিক থেকে এই জাতীয় গানের স্বাতন্ত্র্য থাকায় এই গানগুলির পারিভাষিক নাম ছিল 'প্রবন্ধ'। 'সঙ্গীত রত্নাকরে' চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে –

''পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদিতালতঃ।।''

ছোট ছোট গীতি কবিতা রচনার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এর প্রাচীনতর নিদর্শন পাওয়া যায় কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ক্ষুদ্র অপভ্রংশ গানে। ক্রমে লৌকিক ভাষায় এই রকম গান রচনার রীতি সমগ্র উত্তর ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃত জ্ঞান-হীন, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষদের কাছে এই ধরনের গানের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার বিশেষ সহায়ক ছিল মনে করা যেতে পারে। চর্যাগীতির উদ্ভবও এই পথে বলে মনে হয়।

গানের ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গেই ছন্দ ও তালের বিশেষ ভূমিকা আছে। চর্যাগীতি রচয়িতাদের সামনে ছন্দের দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল। একটি হল অভিজাত সংস্কৃত ছন্দ এবং অন্যটি লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দ। চর্যাকারগণ সংস্কৃতের ছান্দসিক আদর্শকে গ্রহণ করেননি। গানের তালের মধ্যে মাত্রা ও অক্ষরের অপূর্ণতার ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ থাকায় সংস্কৃত ছন্দের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের প্রয়োজন কবিরা অনুভব করেননি। অপেক্ষাকৃত লৌকিক আদর্শ হিসাবে অপভ্রংশের ছন্দরীতি চর্যাকারদের রচনায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতের মত অপভ্রংশেও মাত্রা সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি বা লঘু গুরু শব্দ বিন্যাসের ব্যাপারে কিছু নিয়ম ছিল। এই সব নিয়মও বাংলা ভাষার বিশেষ প্রকারের শ্বাসাঘাত বিশিষ্ট উচ্চারণের পক্ষে সর্বদা অনুকূলে ছিল না। তাই অপভ্রংশের যে ছন্দরীতিগুলিতে লঘু গুরুক্রম সম্পর্কে কিছুটা শৈথিল্যের সুযোগ ছিল সেগুলিকেই কবিরা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। এই রকম স্থিতিস্থাপক ছন্দের মধ্যে চর্যাগীতিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে 'পাদাকুলক ছন্দ'। আদ্য স্বরাঘাতজনিত মাত্রা হ্রাসের পথ ধরেই ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক থেকে পরবর্তীকালে চতুর্দশ মাত্রিক পয়ার ছন্দের সূচনা সম্ভব হয়েছিল। তবে চর্যার অনেক গানে চউপইআ, চউবোলা, মরহট্টা ইত্যাদি দীর্ঘতর মাত্রার ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে বা প্রভাব পড়েছে। তবে তান বা সুরের আধারে পরিবেশিত হওয়ায় ছন্দপতন হলেও তা শ্রোতাদের শ্রবণ সুখকে পীড়িত করেনি বলেই মনে করা যায়।

চর্যাগীতির ভাষা প্রসঙ্গে ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "the influence of the Sauraseni Apabhramsa was very great on it; and occasionally of Sanskrit and the literary Prakrits of the second MIA period' (ODBL)। প্রকৃতপক্ষে চর্যাগানে শৌরসেনী অপভ্রংশ, মৈথিলী, ওড়িয়া, হিন্দি, অসমিয়া, প্রভৃতি নানা ভাষার প্রচুর শব্দ থাকলেও মূলত বাংলা ভাষার অন্তর্গত বলেই চর্যাগীতিকে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দ্বৈত অর্থ প্রকাশের কারণে চর্যার ভাষাকে সন্ধ্যাভাষাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ বিচারে স্বীকার করতেই হয় যে চর্যাগীতি বাংলার সম্পদ। অর্থাৎ বাংলা গানের আদি পর্বে

চর্যাগীতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল মহিমায় স্থিত। চর্যাগীতিগুলির সাঙ্গীতিক কাঠামো কেমন ছিল তা অনুমান করা যায় রাগ ও তালের উল্লেখ দেখে। মোট কুড়িটি রাগ ব্যবহৃত হয়েছে চর্যাগীতির ক্ষেত্রে। এই রাগগুলি হল - অরু, কহ্নুগুঞ্জরী, কামোদ, গউড়া, গবড়া, গুঞ্জরী, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ধনসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, বলাড্ডী, ভৈরবী, মল্লারী, মালসী, মালসীগবড়া, রামক্রী এবং শবরী। এত বিচিত্র রাগ রাগিণীতে নিবদ্ধ চর্যার গানগুলি বাংলা সঙ্গীতের আদি পর্বকে যে মুখরিত করে রেখেছিল তা সহজেই অনুমেয়। চর্যার রচয়িতা কবিরা নিজেরাই গাইতেন কিনা, সে সম্পর্কে এখন নিশ্চিত কিছু বলা মুশকিল। তবে কাহ্নপা, লুইপা প্রমুখ কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন সিদ্ধাচার্য। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের মতো এঁদের পক্ষেও গান গাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। গাথা কবিতার কবি তথা গায়কদের মত চর্যার কবিরাও হয়তো ছিলেন একাধারে গীতিকার সুরকার এবং গায়ক। সেই সঙ্গীত ঐতিহ্য আদি ও মধ্যযুগ পার করে আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ-নজরুল পর্যন্ত বহমান ছিল। বাংলা চিত্রগীতির সূচনা লগ্ন থেকে সম্ভবত এই গীতিকার সুরকারদের অভিন্নতা পরিবর্তিত হয়। অবশ্য চর্যাগীতির মধ্যে গূঢ় সাধন তত্ত্ব থাকায় তা কতখানি সর্বসমক্ষে গাওয়া হতো, সেটি নিয়ে সংশয় আছে।

এখন একটি কৌতূহল উদ্রেককারী প্রশ্ন হল যে, বাংলা গানের আদি যুগে, সংগীত, শুধুমাত্র শিল্পের জন্যই শিল্প ছিল! নাকি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও মানব জীবন সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে! বস্তুতঃ শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত কোনো কিছুই সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। একথা ঠিক যে, খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণের পর অবসরের অবকাশে শিল্পের সৃজন মুহূর্ত ঘনিয়ে ওঠে। চেতনা আশ্লিষ্ট মানব হৃদয় সেখানেই পশুর থেকে স্বতন্ত্র। আবার একথাও সত্য যে, শিল্প সাহিত্য কোনো নিরালম্ব - বায়ুকৃত পদার্থ নয়। কল্পনার আকাশে তার উড়ান কিন্তু শিকড় বাস্তবের, গভীর মাটিতে প্রোথিত। বাংলা সঙ্গীতের আদি পর্বেও তাই দেখি, আপন সাধন তত্ত্ব ও রস সৃজনের বিমূর্ততার মধ্যেই চকিতে প্রকট হয়েছে সমকালীন মানব জীবনের অনুষঙ্গ। মূলত নিম্নশ্রেণির প্রান্তিক মানুষের যাপিত জীবনের নানান জলছবি চর্যাগানের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সমাজের উচ্চবর্ণীয়দের ভণ্ডামি ও অস্পৃশ্যতা চর্যাগীতিতে এইভাবে ফুটে ওঠে -

''নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণাড়িআ।।''

আবার শবর-শবরীর জ্যোৎস্না রাতে রোমান্টিক প্রেম মত্ততা —

'কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসূহেঁ ভেলা।'

প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় নারীর সাহসিনী হয়ে ওঠার চিত্র —

''দিবসই বহুড়ী কাউই ভরে ভা।
রাতি ভইলে কামরু জা।''

আবার কখনো প্রকৃতির অনবদ্য প্রতিফলন ঘটেছে চর্যার গানে -

'তইলা বাড়ির পাঁসের জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।''

রোমান্টিক কবিত্ব এবং বাস্তবের অনুকরণ এই দুইয়ের মিশেলে আদি পর্বের বাংলা গান এমন এক সাঙ্গীতিক জগৎ তৈরি করেছিল যে, বাঙালি হিসাবে তার জন্য গর্ববোধ করা যায়। যদিও হাজার বছরের ব্যবধানে আজ সেই গানের ভাষা ও ভাবনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা কঠিন। তবুও বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে তার গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। অষ্টম-দ্বাদশ শতকের ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তিত হলে চর্যাগীতি রচনার ধারাও স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সাঙ্গীতিক প্রভাব বাঙালি মনন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তাই মধ্যযুগের কিছুটা ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বৈষ্ণব পদাবলী, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যগ্রন্থগুলিও গানের সুরেই গাওয়া হত। বিশেষত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, গীতিকা সাহিত্য, বাউল গান প্রভৃতি একেবারে গীত হিসাবেই রচিত হয়েছিল। চর্যাকবিদের চন্দ্র সূর্য, গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি উপমা নাথ

পন্থীদের রচনাতেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের যা 'গোপন পীরিতি', বাউলদের কাছে সেটাই 'মনের মানুষের সন্ধান। অর্থাৎ চর্যাগীতিকারদের দেহাশ্রয়ী যোগসাধনা ও সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সাধকদের মধ্য দিয়ে উত্তর কালেও নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। তাই চর্যাগীতির প্রহেলিকা বিলাসেই যেন মধ্যযুগের কবি লেখেন -

'গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি
তবে তো রসিকরাজ।''

এই উত্তরাধিকার যেন রবীন্দ্রনাথের গানেও প্রস্ফুটিত হয়েছে। রবীন্দ্র গানের সহজ অধ্যাত্ম ভাবুকতা ও বিমূর্ততা আদি পর্বের বাংলা সঙ্গীত ঘরানার স্মৃতি সুরভিত। এযুগের বহু বিচিত্র ও সমৃদ্ধশালী বাংলা সঙ্গীতের সূত্রপাত সেই আদি পর্বের বাংলা সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলেই। ইতিহাসের খাতিরে তা আজ নিশ্চিতভাবেই স্বীকার করে নিতে হবে।

# স্মরণে মননে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

**ড. শ্রীতম মজুমদার**

**অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ**

আমাদের সাথে শ্রীশবাবু'র নামটির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী'র কয়েকটি চিঠিতে ও মানসী'র দু-একটি কবিতায় যেখানে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতিচারণ করে বলেছেন 'আহা! শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

আর 'মানসী' তে শ্রীশবাবুর প্রসঙ্গ আসে দুটি কবিতায়। প্রথম কবিতাটির নাম 'পত্র'। প্রথম প্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকায়, বৈশাখ, ১২৯৪। শ্রীশচন্দ্রকে 'বাসস্থান পরিবর্তন' উপলক্ষে পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাখানি পাঠিয়েছিলেন। রচনাকাল ধরে সাজালে এই কবিতাটিই 'মানসী'র প্রথম কবিতা হিসেবে কাব্যের প্রথম সূচিতে ঠাঁই পেয়েছে এবং দ্বিতীয় কবিতাটি 'শ্রাবণের পত্র', প্রকাশকাল ১৮৭৭ তে, যদিও প্রথম প্রকাশ পায় 'ভারতী' পত্রিকায়, আশ্বিনের ১২৯৪ তে 'শ্রাবণে' নামে।

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলেছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কে হন? তাঁর সাথে কিসেরই বা এত সৌহার্দের পরিচয়? স্বভাবতই, এসব কৌতূহলী প্রশ্নগুলি মনের মধ্যে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। এরকম একজন মানুষ যাকে রবিঠাকুর 'বাবু' বলে সম্বোধন করেন, তিনি আর যেই হন না কেন, এটা বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না যে তিনি কাছের জন, নিকট আত্মীয়। যৌবনের দিনগুলো থেকেই বন্ধুত্বের সূচনা। একদিকে তিনি ছিলেন সাহিত্যরসিক, অন্যদিকে তুখোড় সমালোচক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যসেবার পথ ধরেই দুই প্রতিভার পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে।

সংসারে মাঝে মাঝে আমরা এমন এক একজন মানুষের সন্ধান পাই, যিনি ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সর্বত্রই বিরাজমান। যাকে না হলে আমরা একটুও তিষ্ঠতে পারি না। অথচ বিদায়বেলায় যখন তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর সময় আসে তখন একেবারে ভুলে যাই। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, সাময়িক পত্রের সংসারে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এমনই একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ এবং এক সম্পূর্ণ বিস্মৃত ব্যক্তি।

বাঙালির সমাজ ও সংসার জীবনকে সার্বিকভাবে জানার ও জানানোর যে বাসনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন সে উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হয়েছিল তাঁর ছোটগল্পে। বাঙালি মানুষের সমাজ সংসারের আলোছায়াময় জীবনের বাকি স্বরূপটুকু আঁকার জন্য তিনি নবীন লেখকদের যে আহ্বান করেছিলেন বিশ্বকবির সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সাহিত্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশচন্দ্র ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের ন'পাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কবি বলরাম দাসের বংশধর ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা শ্রী প্রসন্নকুমার মজুমদার, পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। ছেলেবেলা শুরুর ৭-৮ বছর তিনি গ্রাম ন'পাড়াতেই ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাবার কাছে পুঠিয়ায় চলে আসেন। সেখানে পুঠিয়ার মহারানী শরৎসুন্দরী দেবীর স্নেহের পরশে শ্রীশচন্দ্রের বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম ভাগ কাটে। শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন- 'পুঠিয়া রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট।'

১৮৭৬ এ বোয়ালিয়া (বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী) স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। কিশোরকাল থেকেই মাতৃভাষার প্রতি শ্রীশচন্দ্রের এক গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মহারানী শরৎসুন্দরী দেবীর পড়াশুনার রীতিমতো চর্চা ছিল আর সেই পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা ছোট্ট শ্রীশের মাতৃভাষার প্রতি যে এক প্রবল অনুরাগ সৃষ্টি হবারই ছিল; স্বভাবতই সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মহারানীর উৎসাহ ও প্রশ্রয় শ্রীশচন্দ্রকে সাহিত্য আলোচনায় অপরিসীম আগ্রহী করে তুলেছিল। সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন - 'কৈশোরে মাতৃভাষায় পুস্তকরাশির সংস্পর্শে এই রূপ আসিয়া আমি বাংলা সাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। ভালো বই হাতে আসিলেই মাতা (মহারানী) আমায় পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হলে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো শেষ করার পর শ্রীশচন্দ্র পাকাপাকিভাবে পুঠিয়াতেই থাকতে শুরু করেন। সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি স্বদেশের কাজেও মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলির মধ্যে একটি হল - বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন

সংস্কারক'। রচনাটি চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচক' এর ৭ম - ৮ম যুগ্ম সংখ্যায় (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১২৮৬) প্রকাশিত হয়। যে চারজন সংস্কারককে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন, তাঁরা হলেন - কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং সুরেন্দ্রনাথ। সে আলোচনায় এক নতুন সমালোচকের চিন্তাশীলতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই নবাগত লেখককে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাহিত্য-সম্রাটের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ- এ সেই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও প্রীত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, উভয়ের মধ্যে প্রীতিভাব দেখা দিয়েছিল তা ভবিষ্যতে আনন্দবন্ধনে পরিণত হয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র নিজে লিখেছেন - 'গুরুশিষ্যের যে সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।' (বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ১ম প্রস্তাব)।

এরপর শ্রীশচন্দ্র পারিবারিক কারণে ও বন্ধু - বান্ধবের পরামর্শে কলকাতায় স্থিতু হন এবং সাহিত্যকেই রুজিরোজগারের ভিত করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ৯ম বর্ষের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে প্রচার বিমুখ হয়ে পড়ে। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছায় এবং চন্দ্রনাথ বসুর জোরাজুরিতে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্বভার নিয়ে মুস্কিল আসান করলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর হাত ধরে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা আবার ডানা মেলল। ডানা তো মেলল তবে উড়তে পারল না। পরবর্তী মাসে 'বঙ্গদর্শন' যথারীতি আগের অবস্থায় ফিরে গেল অর্থাৎ পত্রিকাটি একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে শ্রীশচন্দ্রের ভাই শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটি আবার ছাপাতে চেষ্টা করেন এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার নিতে অনুরোধ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবিঠাকুর সম্মতি সূচক ইশারা দিলে আঠারো বছর পর শ্রীশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' এর ডানায় আবার জোর আসে। শ্রীশবাবু লিখেছিলেন - 'বঙ্গদর্শন' পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল। বঙ্গের প্রধান সাময়িক পত্র যে আমার হস্তে লোপ পাইয়াছিল ইহাতে আমি বড় লজ্জিত ছিলাম। ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এতদিনে আমি সাহিত্য সংসারে একটি ঋণমুক্ত হইলাম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শনের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।'

প্রথম পর্যায় বঙ্গদর্শন বন্ধ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছিল। গানে-সাহিত্যে-সমালোচনায় তাঁদের দিনগুলো পালে হাওয়া লাগিয়ে সোনার তরীর মতো খেয়া দিতে শুরু করেছিল। তবে এই সঙ্গসুখ বেশি দিন টিকলো না। ১৮৫৫তে শ্রীশচন্দ্রকে সাবডেপুটি কালেক্টর পদ পেয়ে কলকাতা ছেড়ে নদীয়া যেতে হল। রাজ কাজের দায়িত্বে থাকাকালীন শ্রীশবাবুকে গয়া, সীতামাঢ়, কাঁথি, বীরভূম, সিংহভূম, লোহারডাগা, পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণায় সময় কাটাতে হয়েছিল। নানা জায়গায় টহল দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ পত্রিকা তত্ত্বাবধানের কাজে বাধা আসছিল, একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। সে কারণেই তিনি তাঁর ভাই শৈলেশচন্দ্রর হাতে বঙ্গদর্শনের গুরুভার তুলে দেন।

শ্রীশচন্দ্র তো স্বদেশের কাজে গা ভাসালেন কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বৎসলের অভাব কবির মনে যে কী নিদারুণ রেখাপাত করেছিল, তা 'ছিন্নপত্র'র বেশ কয়েকখানি চিঠিপত্র পড়লেই দিব্যি হলফ করে বলা যায়। একটু দেখে নেওয়া যাক -

১। 'আপনি তো সাবডেপুটি সাহেব বন্যার মুখে বাংলা মল্লুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন - আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি? ... কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি আর আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে না? (সোলাপুর, অক্টোবর ১৮৫৫)।

২। 'সাব ডেপুটি সাব গয়াধামে আপনি গমন করেছেন, এখন আমার কী গতি করে গেলেন? .... আপনার দর্শন আমার নিয়মিত বরাদ্দের মতো হয়ে গিয়েছিল, এখন তার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি মৌতাতহীন অহিফেন সেবীর মতো ছটফট করচি (১৭ই এপ্রিল, ১৮৬৬)

১৯০৮ সালের ৮ই নভেম্বর এই কর্মব্যস্ত মানুষটি তাঁর সমস্ত কর্ম ব্যস্ততাকে পিছনে ফেলে ধরাধাম থেকে চিরতরে বিদায় নেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ বঙ্গদর্শনের পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে ছেপে বের হয়েছিল - 'পুরাতন বঙ্গদর্শনের শেষ পরিচালক এবং নব পর্যায় বঙ্গ দর্শনের প্রবর্তক ও প্রধান সহায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আর ইহলোকে নাই। গত ২০ শে কার্ত্তিক রবিবারে রাস পূর্ণিমার রজনীতে দুমকায় তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।'

শ্রীশচন্দ্র নিজের প্রতিভাগুণে সাহিত্যাকাশের আকাশগঙ্গা না হলেও পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে সমানে কলম চালানো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আলোচনার বিষয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভকারী যতজন বন্ধুবান্ধব

ছিলেন শ্রীশচন্দ্রেরই তাঁদের মধ্যে কথা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি আছে। বঙ্গদর্শন ছাড়াও 'বালক', সাধনা, ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, সমালোচনী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সাহিত্যকীর্তির দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পদার্পণ, হাতে নিয়ে 'পদরত্নাবলী'। এই একখানি সম্পাদিত গ্রন্থ ছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। পাঁচটিই উপন্যাস।

'পদরত্নাবলী' শ্রীশচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত বৈষ্ণব পদ সংকলনের সোনার ফসল। এই 'পদরত্নাবলী' অর্থাৎ মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগের ফলে সৃষ্ট এই দলিলটি ১৮৮৫ সালের ২৫ শে জুন সুরেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'তখন রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যগুলি পড়িয়া 'পদরত্নাবলী' সংগ্রহ করিতেছিলাম, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের বৈঠক হইত।' (বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ ২য় প্রস্তাব)।

পদরত্নাবলীর প্রথম সংস্করণে বলরাম দাস রচিত পদের সংখ্যা বেশি থাকায়, অনেকে অনুমান করেন কবি বলরাম দাসের উত্তরপুরুষ হওয়ার সুবাদে পদ বাছাইয়ের শ্রীচন্দ্রের ভূমিকা বেশি ছিল।

শ্রীশচন্দ্রের প্রথম লেখা উপন্যাস 'শক্তি কানন'। এটি ১৮৮৭ সালের ৮ই মে প্রকাশিত হয়। সমকালীন গ্রাম্য জীবন ও তার পরিবেশকে লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে ঘরোয়া রূপে এই উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। গ্রাম্য জীবনের উপর কল্পনার জাল বুনে বুনে এক ইতিহাস গড়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন - 'দেড় শত বৎসর আগেকার বাঙালা লইয়া শক্তি কানন রচিত। শক্তি-কাননের সমস্তই গ্রাম্যদৃশ্য, গ্রাম্য লোকের জীবনকাহিনী।'

শ্রীশচন্দ্রের 'ফুলজানি' উপন্যাসটিই তাঁর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। ১২৯৫-৯৬ সালের 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। তবে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৩ই মার্চ, ১৮৯৪। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় উপন্যাসখানির যে সমালোচনা লেখেন তা পরবর্তীকালে তাঁর আধুনিক সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের শিল্পী স্বভাবের মূল দিকটি তুলে ধরেছেন সুস্পষ্টভাবে - 'পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য দক্ষতার কাজ, বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে।'

'ভারতী'তে 'ফুলজানি' পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে এক চিঠি লেখেন, যেখানে শ্রীশবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কলমে এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ধরা পড়ে - ''আপনার লেখা আমার ভারি ভালো লাগে, যার মধ্যে কোনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোন লেখকের লেখাতে দেয় না।'

ঔপন্যাসিকের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'কৃতজ্ঞতা'। 'সাধনা' পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় যদিও গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ২২ শে মার্চ ১৮৯৬ খ্রিঃ।

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে শ্রীশচন্দ্রের 'বিশ্বনাথ' উপন্যাসটি রচিত। প্রকাশকাল ১২ই অক্টোবরের ১৮৯৬। 'সাহিত্য' পত্রিকায় উপন্যাসটি 'প্রতিশোধ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশে ডাকাতের কাহিনী অবলম্বনে সমগ্র উপন্যাসটি বর্ণিত বলে লেখক নামটি বদলে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ''প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলায় প্রেরিত হই। সেই সময়ে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 'বালক' নামক মাসিক পত্রে নদীয়া ভ্রমণ সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বনাথের কথা কিছু ছিল।''

'রাজ-তপস্বিনী' রচনাটির পশ্চাতে আছে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শ্রীশচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলায় যে দেবীর সংস্পর্শে এসে মাতৃভাষার পাঠ নিয়েছিলেন, শৃঙ্খলার সাথে জীবনাদর্শের তালিম নিয়েছিলেন, তাঁরই প্রতি গুরুদক্ষিণা দিতে বঙ্গদর্শনের পাতায় মহারানীর জীবন প্রসঙ্গ তিনি লিখতেন। লেখকের মৃত্যুর পর শৈলেশচন্দ্র মজুমদার লেখাগুলিকে একত্রিত করে 'রাজ-তপস্বিনী (১৯১২) গ্রন্থরূপে পাঠকের হাতে তুলে দেন।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও শ্রীশচন্দ্রের নানা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি তৎকালীন পত্রিকায় শোভা বাড়িয়েছিল কিন্তু বই আকারে বের হয় নি। এরকম কতগুলি রচনা হল - পাঠশালা, চৌকিদার, সদানন্দ, কালিকানন্দ, জামাইষষ্ঠী, স্বয়ংবর,

ভট্টাচার্য-মহাশয়, রায়-গৃহিণী, ভীমচুলহা, রাজ্য-বিজয় প্রভৃতি গল্প। এ ছাড়াও বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন, নদীয়া ভ্রমণ, বাঙ্গালার বসন্তোৎসব, মেলা-দর্শন, রোপণীর গান, লোরিকের গান ১ম প্রস্তাব ও ২য় প্রস্তাব, বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ, ১ম,২য়, ও ৩য় প্রস্তাব প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং রায়বনী দুর্গ নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি।

গ্রামীণ বাংলাদেশের ছিটেবেড়ার দেওয়ালগাথা বাড়ি-ঘর, মাটির গন্ধমাখা পথ-ঘাট ও ছায়ঘন গ্রাম বাংলাকে তিনি চিনতেন। ফলত গ্রাম বাংলার সাথে ও সেখানে বসবাস করা মানুষগুলির সাথে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তাঁর শক্তি-কানন, ফুলজানি, বিশ্বনাথ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উপন্যাসে প্রতিফলিত নিজের আঁতের কথা খুব সহজেই তিনি আপামর পাঠকের মনে অতি সারল্যে প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে সে কৃতিত্ব আজও অমলিন। তাঁর উপন্যাসের বর্ণন কৌশল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সৌন্দর্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে তাঁর জন্য কোনরূপ কৃত্রিম মাল-মসলার আবশ্যক পড়ে না।'

উনিশ ও বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত এই গৌণ ঔপন্যাসিক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র, যাঁর সান্নিধ্যে রবীন্দ্রচিত্ত প্রসন্ন হত এবং বিচ্ছেদে মনের আনচানানি বাড়ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুখের স্মৃতি জড়িয়ে বলতেন, 'আহা! শ্রীশবাবু লোকটা ছিলেন ভালো।'

**সহায়ক বইপত্র -**

১। ছিন্নপত্রাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। মানসী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। ভারতকোষ
৪। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয় - পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫। সাহিত্য সাধক চরিতমালা - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৬। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন।

# বিদ্যালয় প্রসঙ্গ ঃ আজকের অবস্থান

**জয়ন্ত মন্ডল**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

একদিন একটি বাচ্চা বাবার সাথে কোথাও যাচ্ছিল। সে দেখল একটি ছাগলকে একজন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, আর ছাগলটা চিল্লাচ্ছে। দেখে বাচ্চাটি বাবাকে প্রশ্ন করল 'বাবা, ছাগলটি ডাকছে কেন? ও কান্না করছে কেন?'

বাবা বলল - ''লোকটি কসাই, ছাগলকে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে।

বাচ্চাটি বলল - (হাসল) আমি ভাবলাম বোধ হয় ছাগলটা ইসকুলে যাচ্ছে (একটু থেমে বলল) বাবা ছাগল কি ইসকুলে যায়?

বাবা বলল - না

বাচ্চা বলল - আমি ছাগল হলেই ভালো হত

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইস্কুলের পরিবেশ বাচ্চাদের স্কুল বিমুখ করছে। কোনো ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষকের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মনে শিক্ষার প্রতি ভয় তৈরি করেছে। শহরের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি প্রায় ছাত্রশূন্য। অতি গরীব ছাড়া কোনো বাবা মা তাদের সন্তান কে বাংলামাধ্যম ইস্কুলে পাঠাতে চাইছে না। বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের আকাশ ছোঁয়া ফিজ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নিয়ে মধ্যবিত্ত বাবা মা শুধু ভালো শিক্ষার জন্য সন্তানকে বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাচ্ছে। গ্রামের দিকেও শিক্ষার ইংরেজিকরণ শুরু হয়ে গেছে। এখানে ৯০ শতাংশ পিতা মাতা বাধ্য হয়েই সন্তানকে বেসরকারি ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে সরকারি বাংলা ইস্কুলে পড়াতে এত সংকোচ বা দ্বিধা কেন? আমরা যদি সরকারি বাংলা মাধ্যম ইস্কুলের দিকে তাকায় তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য করা যাবে -

১। স্কুলে শিক্ষকদের সংখ্যা কোথাও ছাত্রর তুলনায় কম আবার কোথাও অতিরিক্ত বেশি, এমন অনেক কমই স্কুল আছে যেখানে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে।

২। এমন অনেক টিচারস ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে পড়াশুনা কিছুমাত্র না করেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। সেখানে Regular ক্লাশ করতে হয় না। তাই ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে Certificate নিয়ে পাশ করে আসা শিক্ষকদের কাছ থেকে ভালো শিক্ষকতা আশা করা যায় না।

৩। বেশির ভাগ সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুল গুলিতে মিড ডে মিল এর গুণমান প্রশ্নের মুখে, সেখানে রোজ খাবারের গুণমান পরীক্ষা করা হয় না।

৪। একটি বাস্তব সত্য হল, মেধাবী ছাত্রেরা, ছাত্র জীবনে স্কুল শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেনা।' উদাসীন ছাত্রদের জীবনের অন্য সব পেশার দরজা বন্ধ হয়ে গেলে তারাই শিক্ষকতার দরজায় কড়া নাড়ে। জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া অধিকাংশ এই লোক গুলির মধ্যে শিক্ষকতার প্রতি ভালোবাসা খুব কম থাকে। এরা ছাত্র ছাত্রীর সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষকদের ভয় পায়। এই So Called শিক্ষকরাই সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নষ্ট করছে।

৫। সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে প্রচুর শিক্ষক আছেন যাদের শিক্ষকতা পারিশ্রমিক সাপেক্ষ। শিক্ষকতা ভালোবাসার স্থান। যে শিক্ষকরা শুধুমাত্র মাইনের জন্য শিক্ষকতা করে তারা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাননা।

৬। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পার্শ্বশিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষক। উভয় শ্রেণির কর্ম সমান তাই পারিশ্রমিকও সমান হওয়া উচিত, কিন্তু তা নেই। পার্শ্বশিক্ষকদের এই ক্ষোভ এর প্রভাবে স্কুলের শিক্ষা পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

৭। বিশেষ করে প্রাথমিক মাধ্যমিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যে পাঠ্য বইগুলি প্রদান করা হয় তার কিছু কিছু বাবা - মা গৃহ শিক্ষক ও স্কুল শিক্ষকরা অতি নিম্ন মানের বলে মনে করছেন।

৮। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক প্রাথমিক পর্বের জন্য বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির মতো সুযোগ সুবিধা নেই।
৯। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে স্কুলে আসা ও যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় এই শিক্ষকরা মেনে চলেন না।
১০। বিদ্যালয়গুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব অকল্পনীয়, বিশেষ করে toilet গুলিতো কোনো ভাবেই ব্যবহার যোগ্য নয়।
১১। বেশির ভাগ স্কুলের সামনে কোনো মাঠ নেই। আর যে গুলির মাঠ আছে তা খেলাধুলার যোগ্য নয়। গাছের ছায়াহীন মাঠে উঁচু নীচু গর্ত ও ইটের টুকরো ভরা।
১২। একজন প্রাথমিক শিক্ষকের থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে অনেক স্কুলে মিড-ডে-মিল ও উন্নয়নের টাকা সদ্ব্যবহার হয় না।
১৩। সরকারি স্কুল ও বেসরকারি স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে ভবিষ্যতে চাকুরিক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলের বাচ্চারা এগিয়ে থাকছে।
১৪। কর্ম জীবনে কৌশলগত ক্ষেত্রেও বেসরকারি স্কুলের শিশুরা অধিক সপ্রতিভার জন্য সফলতা বেশি অর্জন করছে।
১৫। সরকারি স্কুলের শিক্ষা Black Board ও বদ্ধ ঘরে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তিগত আধুনিক কৌশল সমূহের ব্যবহার হয় না।

এই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে আমাদের প্রস্তাবনাগুলি এই রকম —

১। বাড়িতে প্রজাপতি তখনই আসবে যখন বাড়িতে ফুলের বাগানকে সুন্দর করে সাজানো হবে। তাই স্কুলের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।
২। সবার প্রথমে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সুন্দর করে সাজাতে হবে।
৩। শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে। Dr. A.P.J. Abdul Kalam এর মতে, 'সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে বাবা, মা, ও গুরু। গুরু কে সৎ ও নিষ্ঠাবান হতে হবে।
৪। প্রতিটি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে যারা বিদ্যালয়ের সকল দিককে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে।
৫। সরকারি পাঠ্য বইগুলিকে উন্নত করতে হবে।
৬। সরকারি প্রতিনিধি দ্বারা নিয়মিত স্কুল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৭। বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খেলাধুলার দিকে নজর দিতে হবে বেশি।
৮। শিক্ষাদান সর্বদা বদ্ধ ঘরে না রেখে খোলা মাঠে খেলার মাধ্যমে কখনো কখনো দেওয়া সম্ভব।
৯। খেলার মাঠ ছাড়া বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া অনুচিত।
১০। শিক্ষাখাতে সরকারি আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন।

# কোভিডের সময় দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা

**শুভ পোড়ে**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই আমাদের। যা কিছু ইতিহাস পড়ে জানা। কিছুটা সাহিত্যে বা সিনেমা থেকে জ্ঞান আহরণ। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনের আঁচ পেয়েছিলেন এমন মানুষের সংস্পর্শে এসেছি আমরা অনেকেই। আমাদের আগের সেই প্রজন্মের মানুষ এর মুখে যুদ্ধ পরবর্তী জীবন ও সমাজের কথা শুনে কিছুটা আন্দাজ তো নিশ্চয়ই হয়েছে।

আদতে যে কোনও বৃহৎ ঘটনার দুটি দিক থাকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যুদ্ধে সরাসরি জড়িত পক্ষ তো বটেই, যারা নয়, তাদেরও জীবন প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় পরবর্তী ঘটনাক্রমে। বলা বাহুল্য মন্দ প্রভাবই বেশি। মুষ্টিমেয়, কজন অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাকিরা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও কেউ কেউ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। সারা বিশ্বজুড়েই আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের রূপরেখাটাই বদলে দেয় যুদ্ধ।

আমাদের জীবদ্দশায় করোনা ভাইরাস (Sars - COV-2) সম্ভবত সেই বিশ্বযুদ্ধের আগুনে আঁচই নিয়ে এল। এর সরাসরি প্রভাব কতটা ভয়াবহ তা প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা বা সরকারি ব্যবস্থায় প্রাপ্ত খবরের আপডেটের মাধ্যমে অবগত হচ্ছি আমরা। এখনও পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে সেই প্রত্যক্ষ প্রভাব নিয়েই উত্তাল বিশ্ব। সেটাই স্বাভাবিক, যে রোগ আন্তর্জাতিক মহামারী বলে ঘোষিত। যার প্রতিষেধক এই সময় বের হলেও প্রারম্ভিক লকডাউনে ছিল আয়ত্তের বাইরে। তা নিয়ে আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা তো হবেই। যদিও এর থেকে কোনো অংশে কম নয় এর পরোক্ষ বা পরবর্তী প্রভাব।

সেনসেক্স সূচক তলানিতে ঠেকেছে, এ খবর রোজ দেখছি আমরা। শেয়ার বাজারের ওঠানামার সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতি ও তার প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুল্যমূল্য বিচার বাজার বিশেষজ্ঞরা করছেন প্রতিনিয়ত।

বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক লেনদেন ভয়ঙ্কর তলানিতে এসে ঠেকেছে। পর্যটন, বিমান ও রেল পরিষেবা, বিনোদন জগৎ, ছোট বড় ইন্ডাস্ট্রি, সব ধরনের ট্রেডিং থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রথম সারির উৎসব অনুষ্ঠান প্রায় সব বন্ধ ছিল। কাজ বন্ধের ফলে আয়ও বন্ধ। ফলে কর্মহীন হতে হয়েছে অগণিত মানুষকে।

ভারতের মতো দেশ যেখানে এমনিতেই অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, তার জন্য এটি একপ্রকার মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত।

করোনা জীবদ্দশায় যাদের ভবিষ্যৎ পুঁজি বলে কিছু নেই, তাদের অবস্থা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে এমন এক প্রেক্ষিতে শ্রমজীবি মানুষের চিরন্তন লড়াই কঠিনতর হয়ে উঠেছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে তবু কিছুটা ভরসা আছে।

'লকডাউন' এর সরকারি সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা, যা করোনার আগ্রাসন রোধ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান উপায় বলে বিবেচিত। আপাতত সত্যি এর কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু ওই যে কিছু মানুষ অপরের সর্বনাশের মাঝেই নিজেদের পৌষ মাস খুঁজে নেয়। সেই সময় লকডাউন ঘোষণার পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছিল, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের যোগানে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না তবু কালোবাজারির সুযোগ পাওয়া মাত্রই মজুত ও যোগানের ঘাটতির খেলা শুরু করে দিয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একদিকে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের রোজগার বন্ধ। কারণ সেই সময় তখন তারা গৃহবন্দি, রোজগার নেই অথচ মূল্যবৃদ্ধি। কোথায় যায় মানুষগুলো!

পরিবহন ব্যবস্থা সেই সময় স্বাভাবিক না থাকার ফলে কিছু সমস্যা হয়েছে।

অর্থনীতির সেই প্রেক্ষিতে জীবনদর্শন ও চর্চা, করোনার প্রভাবে অনেকের দৈনন্দিনতার অভ্যাসেই ধাক্কা লেগেছে। বেঁচে থাকার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় উপকরণ কী, আর কী নয়, পরিস্থিতি সেই পাঠ পড়াচ্ছে আমাদের।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চুক্তিভিত্তিক কর্মী থেকে নির্মাণ কর্মী, ঠিকাদার সংস্থার অধীনে কর্মরত শ্রমিক, এঁদের প্রায় সকলেই

অসংগঠিত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের মজুরি না কাটার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিয়োগকারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন অর্থনীতির বিশ্লেষক রতন খাসনবিশ। তিনি বলেন, 'আমাদের উৎপাদন নির্ভর শিল্পে ৫০ শতাংশ ও পরিষেবার ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ অসংগঠিত শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত।

এই শ্রমিক কর্মচারীদের রোজগার কমে গেলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। বাজারে চাহিদা আরও কমে যাবে।

লকডাউনের সময় মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকেন সেই কারণে এই সময়োচিত পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল সরকার। খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুসারে ২ টাকা কেজি দরে গম ও ৩ টাকা কেজি দরে চাল পেয়েছিল মানুষ। তার অতিরিক্ত বিনা পয়সায় এই চাল গম দেয় দেশের সরকার। যাতে সাধারণ মানুষের দুবেলা দুমুঠো অন্ন পেটে যায়।

এত কিছুর পরও নেতিবাচক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করতে মন চায় না। ইতিহাস বলে, ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি যতবার সমাজের গায়ে আঁচড় বসিয়েছে, যতবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে মানুষের ততবারই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে সমাজে। আর ঘুরেও দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই ঘুরে বা উঠে দাঁড়ানো, এই সংকটে হাতে হাত রেখে, পায়ে পা মিলিয়ে চলাই তো সভ্যতা। দেশের বেশ কয়েকটি বৃহৎ বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে আপৎকালীন এই সময়ে।

মারণ ভাইরাস করোনা এখন বিশ্বজুড়ে বহু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত হলেও একদিন এই খেলার অবসান হবেই। তারপর থেকে শুরু হবে নতুন লড়াই। মানুষ বড়ই শক্তিশালী। বন্যার পর পড়ে থাকা পলি যেমন উন্নত ফসল ফলায়, তেমন করেই এই বিশ্ব একদিন দেখুক, সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্ব জয়ী হয়ে উঠেছে, এই দিনটির জন্যই সকল জগৎবাসী এখন উন্মুখ হয়ে আছে।

# দেশভাগ পরবর্তী চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন মানুষের আলো - আঁধারী জীবনচর্যা

**শুভদীপ মন্ডল**

**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

"Two parts of the land stretch out their thirsty hands
Towards each other. And in between the hands
Stands the man - made filth of religion, barbed wire.[১]

পৃথিবীর 'রাজনৈতিক পাত' সঞ্চরণ যে 'ফাটল' সৃষ্টি করে তা আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে গণ্য করা হয়। যারা এই আন্তর্জাতিক সীমানা বা ফাটলে অবস্থান করে রাজনৈতিক পাত সঞ্চরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকেন, তাদের কাছে এ ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক, ধ্বংসাত্মক এবং অনিশ্চিত। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তির সাথে সাথেই দক্ষিণ এশীয় 'রাজনৈতিক পাতে' হঠাৎ 'ফাটল' ধরে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়; একই সঙ্গে ভারতের (পশ্চিম প্রান্তের মত) পূর্বপ্রান্তেও বৃহত্তর সীমান্ত প্রদেশ সৃষ্টি হয়। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে যখন অমৃত লাভ করেন তখন এক ভাণ্ড গরলও উঠেছিল। আমাদের ভাগ্যেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা রূপ অমৃতের সঙ্গে 'দেশভাগ' নামক 'গরল' জুটেছিল। পাঞ্জাব আর বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় ব্রিটিশ চলে গেলেও দেশের মানুষের একটা বড় অংশ প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।[২]

নতুন রাষ্ট্রগুলোর প্রবণতা হলো 'সমজাতীয়' জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টার স্বার্থে বহু সংখ্যক লোককে নতুন আন্তর্জাতিক সীমানার 'ভুল' পাশে ফেলে রাখা। সেই সব হতভাগ্য লোকেরা ওইসব রাষ্ট্রকে আর নিজেদের রাষ্ট্র বলে গণ্য করতে পারে না। সংখ্যালঘু বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকতে হয় অথবা সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য করা হয়। তাদের মত লোকেরা নতুন রাষ্ট্রে এসে আশ্রয়প্রার্থী বা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।[৩] অর্থাৎ 'নতুন রাষ্ট্র গঠন হল উদ্বাস্তু সৃজনের প্রক্রিয়া'।[৪] ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ভারতের বিভাজনের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি এই প্রক্রিয়ার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত, যেখানে উদ্বাস্তু অভিপ্রয়াণের প্রক্রিয়া ছিল প্রকৃত অর্থেই উভয়মুখী। ঠিক কত সংখ্যক মানুষ এই অভিপ্রয়াণের শিকার হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। ভারতের স্বাধীনতা লাভ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থান পর্যন্ত সময়কালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী প্রায় ষাট লক্ষ বাস্তু চ্যুত মানুষ ভারতে আসে। অপর দিকে ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় পনের লক্ষ।[৫] তবে ভারতে আসা বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সরকারি হিসেব অনুযায়ী চারটির মধ্যে তিনটি পরিবার) বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যায়।[৬] সেক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট লক্ষ্য করেন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ বছরের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাত্র পাঁচ বছরেই সম্পন্ন হয়।[৭] উক্ত প্রায় দুই দশকে ভারতে আসা আনুমানিক ৫১.৪৪ লক্ষ অভিবাসীর মধ্যে প্রায় ৩৮.৪১ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল।[৮] বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি এমন সব স্থানে যায় যা তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য 'অর্থবহ'। সীমান্তবর্তী জেলা, শহর ও শহরতলি অঞ্চলে বাস্তুচ্যুত মানুষের ঢল নামে। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষের সিংহভাগই (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) চব্বিশ পরগণা, নদীয়া এবং কলকাতা এই তিন জেলায় গিয়েছিল।[৯]

তবে এইসব বাস্তুচ্যুত মানুষের ক্যাম্প, কলোনি জীবন, বিভ্রান্তিকর সরকারি নীতি, আর্থিক স্বচ্ছলতার মানদণ্ডে পুনর্বাসন, নানান রাজনৈতিক দলের কুচক্রী খেলা (দণ্ডকারণ্য, মরিচঝাঁপি নীতি) সহ কঠিন জীবন সংগ্রামের ইতিকথা বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে বা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের আবর্তে নানাবিধ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাস্তুহারা মানুষের চাপ সহ্যকারী

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের দুই জেলা, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার আন্তর্জাতিক সীমান্তপার্শ্বের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে নবাগতদের আর্থসামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে জটিল জীবনচর্চার উদ্ভব হয় বা নতুন আন্তর্জাতিক সীমান্ত কিভাবে তার সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার প্রভাব ফেলে এ বিষয়ে ইতিহাসগত প্রেক্ষিতে স্বল্পই আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি এই প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা লাভ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের উক্ত জেলাদ্বয়ের সীমান্তপার্শ্বে বসবাসকারী মানুষদের জীবনচর্যার নানাদিক ও তাদের জীবন সংগ্রামের নানা চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। (এই ইতিহাসমূলক গবেষণার জন্য আমি বেশ কিছু প্রথম ও দ্বিতীয় সারির তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়েছি)।[১০]

'দেশভাগ' নামক একটি অগোছালো, পূর্বপরিকল্পনাহীন প্রক্রিয়া মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে রাডক্লিফ রোয়েদাদের (১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭) মাধ্যমে সমাপ্তি ভাবা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র যা এখনও অসমাপ্ত। উল্লেখ্য - সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে অনেকদিন পর্যন্ত রাডক্লিফ নির্ধারিত সীমানার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধোঁয়াশা ছিল, স্থানীয় অনেকেই এই সীমানাকে সাময়িক ভেবে দুটি দেশের একত্রীকরণ সম্পর্কে তীব্র আশাবাদী থাকলেও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। যখন এই সীমান্ত কঠোর হতে থাকে, খুঁটি, কাঁটাতার, সীমান্তরক্ষী, পাসপোর্ট চালু (১৯৫২ সাল) হতে থাকে তখন থেকেই তাদের জীবনযাত্রা একেবারে এলোমেলো হয়ে যায়।[১১] পরে এ প্রসঙ্গে স্বয়ং রাডক্লিফ আক্ষেপ করে বলে ....

" I was so rushed that I had not time to go into the details;..... what could I do in one and half"[১২]

দেশভাগ পরবর্তী বাংলার অবস্থা তৎকালীন পাঞ্জাবের মতো দুর্ভাগ্যজনক ও নৃশংস না হওয়ায় স্বাধীনতা পরবর্তী অনেকদিন পর্যন্ত (প্রায় দশ বছর) ভারত সরকার এখানকার সঙ্কটের কথা স্বীকার করতে চায়নি। নেহেরু বাংলার অভিপ্রয়াণকে 'কাল্পনিক ভীতি' ও 'ভিত্তিহীন গুজবের ফল' বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে সরকারের পুনর্বাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের বিচ্ছিন্ন করে, তাদের দলবদ্ধ অবস্থা ভেঙে দিয়ে যতটা সম্ভব কলকাতার বাইরের 'খালি' জমিতে পাঠিয়ে দেওয়া, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু 'অগ্নিকুন্ড' কে শহরের অন্যান্য 'দাহ্য' উপাদানের থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।[১৩] পশ্চিমবঙ্গে সরকারি উদ্যোগে যে ৩৮৯ টি উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠা করা হয় তার একটিও কলকাতায় ছিল না, মোট ১৫২ টি ক্যাম্প ও হোম-এর মধ্যে মাত্র ৭টি ছিল কলকাতায়, অপরপক্ষে চব্বিশ পরগণায় কলোনি এবং হোম এর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০৯ টি এবং ৪৫ টি।[১৪] ১৯৫৮ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী চব্বিশ পরগণায় ক্যাম্প কলোনি বহির্ভুত মানুষের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৬০ লক্ষ ১৫ হাজার), সর্বাধিক উদ্বাস্তু গ্রহণকারী জেলাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল নদীয়া।[১৫]

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গে চাষাবাদকারী অধিকাংশ উদ্বাস্তুই এই জেলাদ্বয়ের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর কৃষিপ্রধান এলাকায় খালি জমি দখল করে দলবদ্ধভাবে বাস করতে থাকে। এদের অধিকাংশ মানুষই ছিল 'নিজের চেষ্টায় বসতি স্থাপনকারী'। টেটসূয়া ন্যাকাতালি দেখান সীমান্তপার্শ্ববর্তী পরিবারগুলোর অর্ধেকের বেশিই আসে 'আত্মীয়দের মাধ্যমে' (শুধু আত্মীয় সম্পর্ক নয় সাদৃশ্য সম্পর্কেও তারা ব্যবহার করেছিল)। এই জেলাগুলিতে তাদের বৈবাহিক সূত্রে নিকট আত্মীয় ছিল, প্রায় ক্ষেত্রে তারা মহিলা, বিবাহিত মেয়ে-বোন, ঠাকুমা-দিদিমা, মাসি-পিসি যাঁরা তাঁদের বসতি স্থাপনের সাহায্য করেছিল। [১৬]

প্রাণ নিয়ে কোনমতে এপারে আসতে পেরে স্বস্তি পেয়েছিল এমন জনসমাগমও দেখা যায়, যারা বসতি স্থাপন করেছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়। এছাড়া মুসলিমদের সঙ্গে আপোস বা জোর করে সম্পত্তি বিনিময় করে বসতি স্থাপনের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। খুলনা ও যশোরে ১৯৪৯ -৫০ সালের দাঙ্গার সময় নমঃশূদ্র কৃষকরা আক্রমণকারী লোকেদের থেকে পালিয়ে নিকটবর্তী সীমান্ত অতিক্রম করে নদীয়াতে আসে এবং স্থানীয় দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেখানকার মুসলিমদের বিতাড়িত করে ও চাষের জমি দখল নেয়। স্থানীয় আদি বসতির সঙ্গে উদ্বাস্তু বসতিগুলো অদ্ভুত ভাবে মিশে গিয়ে এক প্রকার 'দো-আশঁলা' বসতিতে পরিণত হয় সীমান্তবর্তী জেলাগুলি। তাদের শহুরে চাহিদা নির্ভর গ্রামীণ জীবনধারা, আদি ও নতুন বসতির সহাবস্থান এক জটিল জীবনচর্চা সৃষ্টি করে।[১৭]

এই মিশ্র বসতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন ঘটায় নতুন আন্তর্জাতিক সীমান্ত। পূর্ব প্রচলিত দৈনন্দিন কাজকর্ম

হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক অপরাধ। নদীয়ার কাজীপুরে এক হিন্দু ভূস্বামী তার অধীনস্থ অপরপারের ভাগচাষীদের থেকে বার্ষিক শুল্ক আদায় করতে গেলে পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীর তরফে তাকে পুনরায় আর না আসার জন্য সতর্ক করা হয়। অপরদিকে কুষ্টিয়ার এক গোয়ালা এপারে নদীয়াতে দুধ যোগান দিতে আসার পথে পুলিসের গুলিতে নিহত হন। নদীয়া চাপরা থেকে ঠাকুরপুকুর যাওয়ার পরে এক কুমোরকে লুট করা হয়। বজিতপুর অঞ্চলের একজন ঋণপ্রদানকারী যশোরে টাকা আদায় করতে গেলে সেখানে গ্রেপ্তার হন। প্রায় প্রতিবছরই সীমান্তের দুপার থেকে অবৈধভাবে ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। নদীয়ার পাথরঘাটা-বেতাই, চব্বিশ পরগণার বাগদা-গোবরা, পূর্ববঙ্গের ভোমরা প্রভৃতি অঞ্চলে সাপ্তাহিক হাট বিপর্যস্ত হয়। পণ্য সরবরাহকারী ও ক্রেতার মাঝে এসে পড়ে নতুন আন্তর্জাতিক সীমান্ত কাঁটাতার, স্বাভাবিক দৈনন্দিন লেনদেনও অবৈধ হয়ে ওঠে।[১৮] চারণভূমিতে গবাদিপশু সীমারেখা অতিক্রম করলে বিপরীত পারের গ্রামবাসী, পুলিশ তা আটকে রাখত। বিথারি, কুইজুড়ি, পানিতার, ইটিন্ডা, প্রভৃতি স্থল সীমান্ত অঞ্চলে ডাকাতি এবং গবাদিপশু চুরি হয়ে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা।[১৯] নদী বা জল সীমান্ত অঞ্চলে মৎস্য শিকার আতঙ্কের হয়ে ওঠে। বিপরীত পারের সীমান্তপ্রহরী তো বটেই কখনও কখনও নিজের দেশের সীমান্ত প্রহরীদের কাছেও হেনস্তার শিকার হতে হয় মৎস্যজীবীদের, এমনকি একপারের মৎস্যজীবীরা অপর পারের মৎস্যজীবীদের লুটও করতে থাকে। ১৯৫০ সালে নদীয়ার করিমপুরে মাথাভাঙ্গা নদীতে মাছ ধরতে গেলে বলাই মন্ডল নামে এক ব্যক্তি পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৯৫১ সালে চব্বিশ পরগণার গাইঘাটার কিছু মৎস্যজীবী ইছামতী নদীতে মাছ ধরতে গেলে তাদের উপর গুলি চালায় ওপারের সীমান্তরক্ষী।[২০] এছাড়া হাসনাবাদ, কালুতলা, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ওপারের সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে এপারের মৎস্যজীবীদের খণ্ডযুদ্ধের কথা শোনা যায় তাদের মুখেই। এমনই সব ঘটনা হয়ে ওঠে সীমান্তপার্শ্বে বসবাসকারী মানুষের নিত্যসঙ্গী।[২১]

এছাড়াও হসপিটাল, ডিস্পেন্সারি, বিদ্যালয়, আদালত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা হয়ে পড়ে এগুলির সুবিধাভোগীর অগণিত সাধারণ মানুষ ও কর্মচারী। চব্বিশ পরগণা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তৎকালীন প্রশাসনিক কার্যালয় এর উপভোক্তাহীনতার প্রত্যক্ষ বিবরণ দেন।[২২] কাজীপুরের ডিস্পেন্সারি থেকে ফেরার পথে নদীয়ার করিমপুরে এক ডাক্তার গ্রেফতার হন (দুদিন পর দুই হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে তিনি ছাড়া পান) এবং তিনি কাজ হারান, পাশাপাশি ডিস্পেন্সারি ও কাজীপুরের মানুষ তাদের অভিজ্ঞ ডাক্তারকে হারায়।[২৩]

সর্বোপরি এই সীমান্ত বহু মানুষকে তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়, বিশেষত সেই সব হতভাগ্য মহিলারা যাদের বাপেরবাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি সীমান্তের বিপরীত দিকে পড়ে যায়। এমন বহু জীবনের করুণ কাহিনী পুলিশের রেকর্ড বা সরকারি দলিল দস্তাবেজে না থাকলেই থেকে যায় মানুষের স্মৃতিতে দেশভাগের যন্ত্রণার গাথা রূপে।

তবে প্রাথমিক ভাবে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো অধ্যায়ের সমাপ্তিকরণে ১৯৪৮ সালে আহূত ঢাকা সম্মেলনে উভয় দেশের সম্মতিক্রমে বেশ কিছু নতুন নীতি গৃহীত হয়েছিল -

১। সীমান্তের অপরপারের সম্পত্তির ওপর বৈধ অধিকার প্রদান।

২। দেশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার।

৩। সীমান্ত সংলগ্ন মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিপরীত পারে যাওয়ার অনুমতি প্রদান।[২৪]

তথাপিও এর ফলাফল ছিল বিশৃঙ্খল। সীমান্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমান্তরক্ষীদের এড়িয়ে বা পরোক্ষ সম্মতিতে চোরাচালান সহ বহু অবৈধ কাজকর্ম পেশা হিসেবে বেছে নিতে থাকেন স্থানীয় মানুষ। দেশভাগ যখন স্থানীয় মানুষকে পূর্ববর্তী সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তখন এই চোরাচালান তাদের আয়ের নতুন রাস্তা হিসেবে উন্মোচিত হয়।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে Border Secret Police এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য বস্ত্রসহ প্রায় সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় পণ্য পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলায় চোরাচালান করা হয়।[২৫] ১৯৫০ সালের পাক্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় যে চাল, কাপড়, লবন, সাবান, দেশলাই, তামাক, সিগারেট, টর্চের সেল প্রভৃতি পূর্ববঙ্গে যেত এবং পূর্ববঙ্গ থেকে প্রধানত পাট এছাড়া সুপুরি, লঙ্কা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে আসত। ১৯৫০ সালের অপর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী কাঁচালঙ্কা, সর্ষের তেল, কাপড়, গোলমরিচ প্রভৃতি ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে যেত।[২৬]

সীমান্তপার্শ্ববর্তী এইসব মানুষের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবন যুদ্ধে যে কোনো প্রকারে টিকে থাকা প্রাধান্য পেয়েছিল, 'দেশভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা' তাদের কাছে ছিল বিলাসিতার নামান্তর। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক (এমনকি বৃদ্ধ) স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কাজের লোভ দেখিয়ে, বিয়ে করে শিশু ও নারী পাচার এই সময় কিছু মানুষের পেশায় পরিণত হয়। চব্বিশ পরগণার গুমাতে শান্তি দাস নামে এক উদ্বাস্তু মহিলা বলেন যে তার প্রধান কাজ ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় কিছু উদ্বাস্তু মহিলাকে গুমা থেকে কলকাতা পৌঁছে দেওয়া; যাদের বিভিন্ন পতিতা পল্লিতে বিক্রি করা হত। কখনও মদ্যপ সীমান্তরক্ষীরা নিকটবর্তী গ্রামে ঢুকে মহিলাদের ধর্ষণ করত তখন তাদের আত্মহত্যা অথবা অন্যত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। ২- ১২ বছর বয়সী শিশু অপহরণের পাশাপাশি কখনো ১০০০ - ৫০০০ টাকায় বিক্রি করত বা বিক্রি করতে বাধ্য হত হতভাগ্য পরিবারগুলি। (এভাবে বার্ষিক প্রায় ১৫ হাজার শিশুকে পূর্ববঙ্গ অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে এনে ঘোড়াদৌড়ের ঘোড়সাওয়ার, যৌনকর্মী, পরিচারক-পরিচারিকা হিসেবে বিক্রি করা হত, বিকলাঙ্গদের ভিক্ষোপজীবী করা হত।) [২৭]

আবার নদী সীমান্তে, ঝুঁকিপূর্ণ নদীপথে গরু পাচর স্থানীয় মানুষদের এক নতুন পেশা হয়ে ওঠে। টাকী-হাসনাবাদ সংলগ্ন এলাকায় চোরাচালানকারীদের প্রায় ৪৫ - ৫০ শতাংশ মানুষের পেশা ছিল গরু পাচার। কর্মসংস্থানহীন জীবনের সিংহভাগ ক্ষেত্রেই জীবিকার মুখ্য অবলম্বন হয়ে ওঠে এই চোরাচালান।

শুধুমাত্র দেশভাগের ফলে আগত উদ্বাস্তুরা নয়, আগে থেকে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবৈধ কাজকর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার 'বৈধ' কাজকর্মেও যুক্ত হন। চব্বিশ পরগণা সীমান্তের ইছামতী নদীর পলিমাটি সমৃদ্ধ বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ, কাটাখালী সহ বৃহত্তর অঞ্চলে গড়ে ওঠা ইটভাটাগুলিতে শ্রমিক হিসেবে মানুষ নতুন পেশার সন্ধান পায়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের এপারে এসে প্রথম পছন্দ ছিল মাথাভাঙা, সোনাই, ইছামতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। নদীয়ার রামনগর, শিকারপুর, চব্বিশ পরগণার আমুদিয়া, হাকিমপুর, কাটাখালি, চাঁপাতলা, চাঁড়ালখালি প্রভৃতি অঞ্চলে মৎস্যজীবী মানুষের বসতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সব স্থানের উদ্বৃত্ত মাছ কাঁকড়া ইত্যাদি নিকটবর্তী বাজারে রপ্তানি করা তাদের পেশা হয়ে ওঠে। এছাড়া পেট্রাপোল, ঘোঁজাডাঙা, গেদে প্রভৃতি 'বৈধ' সীমান্তের পণ্য পরিবাহী গাড়িগুলির 'খালাসি' হিসেবে যোগ দেয় বহু মানুষ।

পুরুষদের সঙ্গে বাড়ির মহিলারাও সৎপথে রোজগারের সন্ধান পায়। চব্বিশ পরগণার হাসনাবাদ, বাঁকড়া, সাহেবখালী অঞ্চলে আগত উদ্বাস্তুদের একটা অংশ বাঁশ ও বেতের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। 'বিড়িশ্রমিক' এক নতুন পেশা হয়ে ওঠে।

নদীয়া সীমান্তের অ-শিল্প প্রধান অঞ্চল বা চব্বিশ পরগণার সীমান্তবর্তী প্রান্তিক অঞ্চল, ১৯৪৭ সাল পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ক্ষুদ্র অনুন্নত গ্রাম থেকে নিকটবর্তী শহরের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৬১ সালের সেন্সাস কমিশনারও এই কথা স্বীকার করেন।[২৮]

প্রাণের ঝুঁকি, কাজের অনিশ্চয়তা, চরম দরিদ্রতা প্রভৃতি সীমান্ত সংলগ্ন 'দো-আঁশলা' বসতির মানুষজনের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে যা তাদের এই প্রকার বৈধ-অবৈধ কাজকর্মে যুক্ত হতে বাধ্য করে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব শক্তিশালী হলেও সীমান্তে সাধারণভাবে তার বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। [২৯] এক্ষেত্রে বাংলা সীমান্তের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া সীমান্তেও একই অবস্থা লক্ষণীয়।

অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা যায়। আর্থিক টানাপোড়েন এবং অবৈধ কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের যথেষ্ট প্রাণের ঝুঁকি ছিল ফলে আধ্যাত্মিক অবলম্বন হিসেবে স্থানীয় মানুষ দেবতাকে আঁকড়ে ধরে। শক্তি পূজা প্রাধান্য পায়। চব্বিশ পরগণা সীমান্তের বাগদা থেকে হেমনগর পর্যন্ত বৃহত্তর অঞ্চলের কমবেশি ৯৩টি মন্দিরের মধ্যে প্রায় ৬২টি কালী অথবা দুর্গা মন্দির দেখা যায়।[৩০] আধুনিক চিকিৎসার সুবিধাহীন প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের ভরসা রাখতেই হত মা শীতলা, বনবিবি, মা মনসা, মানিকপীর প্রভৃতি দেবতার 'ঐশ্বরিক' শক্তির উপর। ঝাঁড়ফুঁক, মাদুলী, থানের (বেদী) মাটি সহ মন্ত্র পূত জল-নুন-তেল প্রভৃতি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রোগ নিরাময় করত, যা এখনও বংশ পরম্পরায় প্রচলিত। যেমন হাত পা কেটে গেলে এখনও তারা বিশ্বাস রাখে নিম্নোক্ত মন্ত্রে -

'কাস্তিতে *কেটিছে হাত,
দেবী বলে না
সূর্য বলে ঝাড়ায়
নেই রক্ত নেই পুঁজ
দেবী বলে ঘা পুঁজ
কার আজ্ঞি, মানিকির আজ্ঞি
শিগগির গে লাগ্নি।।[৩১]
(* যে অস্ত্রে কাটবে তার নাম)

একই রকম ভাবে গলায় ফোটা মাছের কাঁটা বাছার মন্ত্র হল নিম্নরূপ -

'খাল ধারে শিমূল গাছ
মা করোলার সমুদ্রে বাসা
মাছ খায় হুগরোয়
মাছ খায়, তার না বাছে কাঁটা।
কার আজ্ঞি, মা করোলার আজ্ঞি,
শিগগির গে লাগ্নি।[৩২]

এই মন্ত্র তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, অনেক রোগ নিরাময় করলেও মাঝে মাঝে তার চরম ফল পেতে হয়। যদিও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এইসব প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকত না, সর্বোপরি ভরসা রাখতে হত 'কপালে'র উপর।

অর্থাৎ এভাবেই স্বাধীনতা রূপ অমৃতের সঙ্গে জুটে যাওয়া 'দেশভাগ' নামক 'গরল' কার্যত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল নীলকণ্ঠরূপী উদ্বাস্তুগণ এবং সীমান্তপার্শ্ববর্তী হতভাগ্য মানুষগুলি।

**তথ্যসূত্র ঃ**


১। তসলিমা নাসরিন, 'ব্রোকেন বেঙ্গল,' বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা।
২। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু।
৩। জয়া চ্যাটার্জী, 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল ইন্ডিয়া ১৯৪৭-১৯৬৭।
৪। এ.আর. জোলবার্গ, 'দি ফরমেশন অফ নিউ স্টেটস্ অ্যাজ এ রিফিউজি জেনারেটিং প্রসেস, দ্যা অ্যানালস অফ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, মে ১৯৮৩, ভল ৪৬৭, গ্লোবাল রিফিউজি প্রবলেম ঃ ইউ এস অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রেস্পন্স।
৫। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী ঃ হীরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু'
রূপ কুমার বর্মন, 'পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন দি শিডিউল কাস্টস অফ বেঙ্গল'।
৬। জয়া চ্যাটার্জী 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল এন্ড ইন্ডিয়া ১৯৪৭-১৯৬৭।
৭। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী।
৮। রূপ কুমার বর্মন, 'ফিশারিস অ্যান্ড ফিশারমেন ঃ এ স্যোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ফিশারিস অ্যান্ড ফিশারমেন অফ কলোনিয়াল ওয়েষ্ট বেঙ্গল।
৯। জয়া চ্যাটার্জী, 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল এন্ড ইন্ডিয়া ১৯৪৭-১৯৬৭।
১০। প্রথম সারির তথ্যসূত্র - স্থানীয় ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার, আদমসুমারী রিপোর্ট।
দ্বিতীয় সারির তথ্যসুত্র - উক্ত গ্রন্থসমূহ।
১১। উইমেন ভ্যান সেন্ডেল - 'দি বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া।
১২। ওই (কুলদীপ নায়ার ও চার্লি রাডিক্লিফের সাক্ষাৎকার ১৯৬০)
১৩। জয়া চ্যাটার্জী, 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল এন্ড ইন্ডিয়া ১৯৪৭- ১৯৬৭।
১৪। ওই

১৫। ওই
১৬। টেটসুয়া নাকাতানি, 'অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, দি মুভমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ রিফিউজিস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান টু ওয়েস্ট বেঙ্গল।
১৭। জয়া চ্যাটার্জী, 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল এন্ড ইন্ডিয়া ১৯৪৭- ১৯৬৭।
১৮। জয়া চ্যাটার্জী 'ফ্যাশনিং অফ এ ফ্রন্টিয়ার ঃ দি রাডিক্লিফ লাইন অ্যান্ড বেঙ্গলস, বর্ডার ল্যান্ডস্কেপ ১৯৪৭-১৯৫২'।
১৯। চব্বিশ পরগণার আন্তর্জাতিক স্থল সীমান্তবর্তী উক্ত গ্রামে সাক্ষাতকার।
২০। জয়া চ্যাটার্জী 'ফ্যাশনিং অফ এ ফ্রন্টিয়ার ঃ দি রাডিক্লিফ লাইন অ্যান্ড বেঙ্গলস, বর্ডার ল্যান্ডস্কেপ ১৯৪৭-১৯৫২'।
২১। চব্বিশ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী নদী সংলগ্ন উক্ত গ্রামে সাক্ষাৎকার।
২২। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু।
২৩। জয়া চ্যাটার্জী 'ফ্যাশনিং অফ এ ফ্রন্টিয়ার ঃ দি রাডিক্লিফ লাইন অ্যান্ড বেঙ্গলস, বর্ডার ল্যান্ডস্কেপ ১৯৪৭-১৯৫২'।
২৪। ওই
২৫। ওই (ফোর্থনাইটলি অ্যাপ্রিসিয়েশন অন দি বর্ডার সিচুয়েশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১ম এপ্রিল, ১৯৪৮)।
২৬। ওই (ফোর্থনাইটলি অ্যাপ্রিসিয়েশন অন দি বর্ডার সিচুয়েশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১ম এপ্রিল, ১৯৪৮)।
জয়া চ্যাটার্জী 'ফ্যাশনিং অফ এ ফ্রন্টিয়ার ঃ দি রাডিক্লিফ লাইন অ্যান্ড বেঙ্গলস, বর্ডার ল্যান্ডস্কেপ ১৯৪৭-১৯৫২'
২৭। উইমেন ভ্যান সেন্ডেল, 'দি বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া।'
২৮। চব্বিশ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার।
২৯। উইলেম ভ্যান সেন্ডেল, 'দি বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া।'
৩০। চব্বিশ পরগণার আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষা।
৩১। প্রচলিত মন্ত্র (গোপন)।
৩২। প্রচলিত মন্ত্র (গোপন)।

## গ্রন্থ পঞ্জি

আদমসুমারী রিপোর্ট - (১৯৪১, ১৯৫১, ১৯৬১)
চ্যাটার্জী, জয়া, 'স্পয়েল্স অব পার্টিশন, বেঙ্গল এন্ড ইন্ডিয়া ১৯৪৭- ১৯৬৭। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ ২০০৮।
চ্যাটার্জী, জয়া, 'ফ্যাশনিং অফ এ ফ্রন্টিয়ার ঃ দি রাডিক্লিফ লাইন অ্যান্ড বেঙ্গলস, বর্ডার ল্যান্ডস্কেপ ১৯৪৭-১৯৫২'।
মর্ডান এশিয়ান স্টাডিজ, ভল ৩৩, নং ১ কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।
জোলবার্গ, এ.আর. দি ফরমেশন অফ নিউ স্টেটস্ অ্যাজ এ রিফিউজি জেনারেটিং প্রসেস, দ্যা অ্যানালস্ অফ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশাল সায়েন্স, মে ১৯৮৩, ভল ৪৬৭, গ্লোবাল রিফিউজি প্রবলেম, ইউ এস অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রেস্পন্স, মে ১৯৮৩।
নাসরিন, তসলিমা, 'ব্রোকেন বেঙ্গল,' বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা ১৯৯৩।
নাকাতানি, টেটসুয়া, 'অ্যাওয়ে ফ্রম হোম ঃ দি মুভমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ রিফিউজিস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া, জার্নাল অব দি জাপানিস অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, ১২, ২০০০।
বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরণ্ময়, 'উদ্বাস্তু' দীপ প্রকাশনী, কলকাতা - ১৯৮০।
বর্মন, রূপ কুমার, ফিশারিস অ্যান্ড ফিশারমেন্ট, এ সোশিও ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ফিশারিস অ্যান্ড ফিশারমেন অফ কলোনিয়াল ওয়েস্ট বেঙ্গল, অভিজিৎ পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ২০০৮।
বর্মন, রূপ কুমার, পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস ইম্পাক্ট অন দি শিডিউল কাস্টস অফ বেঙ্গল, অভিজিৎ পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, ২০১২
সেন্ডেল উইলেম ভ্যান, 'দি বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড বিয়ন্ড স্টেট অ্যান্ড নেশন ইন সাউথ এশিয়া।'

# কৃষ্ণ গহ্বর (Black Holes)

**প্রতীক কর্মকার**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

কৃষ্ণগহ্বর শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে উনিশ শতকের ষাটের দশকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক জন হুইপার (John Wheeler ) এই শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন একটি ধারণার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিবরণ রূপে - এ ধারণার বয়স অন্তত দুশ বছর। সে সময় আলোক সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব ছিল ঃ একটি আলোক কণিকা দিয়ে গঠিত, অন্যটি ছিল আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত। এখন আমরা জানি আসলে দুটি তত্ত্বই নির্ভুল। কণাবাদী বলবিদ্যার তরঙ্গ / কল্পিত দ্বৈততার ভিত্তিতে আলোককে তরঙ্গ এবং কণিকা দুভাবেই বিচার করা যায়। আলোক তরঙ্গ দিয়ে গঠিত - এই তত্ত্বের ভিত্তিতে মহাকর্ষ সাপেক্ষে আলোকের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আলোক যদি কণিকা দিয়ে গঠিত হয় তাহলে আশা করা যেতে পারে কামানের গোলা, রকেট এবং গ্রহগুলির মতো আলোক ও মহাকর্ষ দ্বারা একই রকম ভাবে প্রভাবিত হবে। প্রথমে লোকের ধারণা ছিল আলোক কণিকাগুলির দ্রুতি অসীম, সুতরাং মহাকর্ষ তার গতি মন্থর করতে পারবে না, কিন্তু রোমার আবিষ্কার করলেন আলোক সসীম দ্রুতিতে চলাচল করে, এর অর্থ মহাকর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অভিক্রিয়া থাকতে পারে। এই স্বতঃসিদ্ধের উপর ভিত্তি করে জন মিচেল নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী ১৭৮৩ সালে ফিলোজফিক্যাল ট্রানজ্যাকশনস অব দ্যা রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডন পত্রিকায় একটি গবেষণা পত্র লিখে নির্দেশ করলেন একটি তারকার যদি যথেষ্ট ভর এবং ঘনত্ব থাকে তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র দ্রুত এত শক্তিশালী হবে যে আলোক সেখান থেকে নির্গত হতে পারবে না।

তারকারটি পৃষ্ঠতল থেকে বিকিরিত আলোক বেশি দূর যাওয়ার আগেই তারকাটির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তাকে পিছনে টেনে নিয়ে আসবে। মিচাল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন - এরকম বহুসংখ্যক তারকা থাকতে পারে। সেগুলির আলোক আমাদের কাছে পৌছাতে পারবে না বলে আমরা যদিও সেগুলিকে দেখতে পাব না, তবুও সেগুলির মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আমাদের বোধগম্য হবে। এই রকম বস্তুপিন্ডগুলিকেই আমরা এখন 'কৃষ্ণগহ্বর' বলি,। তার কারণ সত্যিই সেগুলি কৃষ্ণগহ্বর, মানে কৃষ্ণ শূন্যতা।

কৃষ্ণগহ্বর কীভাবে গঠিত হতে পারে বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা দরকার একটি তারকার জীবনচক্র। যখন বৃহৎ পরিমাণ গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ (প্রধানত হাইড্রোজেন) নিজস্ব মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চাপে নিজের উপরেই চুপসে যেতে থাকে তখন একটি তারকা গঠিত হয়। তারকাটি সঙ্কুচিত হতে থাকে তার বায়বীয় পদার্থের পরমাণুগুলির ক্রমশ বেশি ঘন ঘন এবং ধাবমান গতিতে পারস্পরিক সংঘর্ষ হতে থাকে - ফলে বায়বীয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত বায়বীয় পদার্থ এত উত্তপ্ত হবে যে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি সংঘর্ষের পর পরস্পর থেকে দূরে ছিটকে যায় না, বরং সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম গঠন করে। এই প্রতিক্রিয়ায় মুক্ত তাপ, যা একটি নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের মতো, তার জন্যই তারকাটি আলোক বিকিরণ করে। এই বাড়তি উত্তাপ গ্যাসের চাপও বাড়াতে থাকে যতক্ষণ না মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যথেষ্ট হয়, তখন গ্যাসের সংকোচন বন্ধ হয়। ব্যাপারটা প্রায় বেলুনের মতো - বেলুনের ভিতরকার বাতাসের চাপ চেষ্টা করে সেটাকে ফোলাতে আর রবারের বিততি চেষ্টা করে বেলুনটাকে ক্ষুদ্রতর করতে, ফলে বেলুন ভিতরের বাতাসে চাপের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তাপ এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ভারসাম্যের ফলে তারকাগুলি বহুকাল পর্যন্ত এইরকম সুস্থিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারকাটি নিজের হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য পারমাণবিক জ্বালানি নিঃশেষ করে ফেলবে। একটি স্ববিরোধী ব্যাপার হল - তারকাটির শুরুতে জ্বালানি যত বেশি থাকে ফুরিয়ে যায় তত তাড়াতাড়ি। এর কারণ তারকাটির ভর যত বেশি হয় মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তাকে তত বেশি উত্তপ্ত হতে হয়। আর তারকাটি যত উত্তপ্ত হবে তার জ্বালানিও তত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

একটি তারকার জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে সেটি শীতল হতে থাকে আর সেকারণে সংকুচিত হতে থাকে। তখন তার কী হতে পারে সেটা প্রথম শোনা গিয়েছিল কেবলমাত্র ১৯২০-র দশকের শেষদিকে।

১৯২৮ সালে সুব্রহ্মন্যম চন্দ্রশেখর নামে একজন ভারতীয় গ্রাজুয়েট ছাত্র কেম্ব্রিজে ব্যাপক আপেক্ষবাদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ স্যার আর্থার এডিংটন এর কাছে বিজ্ঞানচর্চার জন্য জাহাজে চেপে ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। ভারতবর্ষ থেকে জাহাজে আসবার সময় জাহাজে বসেই চন্দ্রশেখর অঙ্ক কষে বার করেছিলেন ব্যবহারের ফলে সমস্ত জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে নিজের মহাকর্ষের বিরুদ্ধে নিজেকে বহন করতে হলে একটি তারকার ভর কত হতে হবে। ভাবনাটি ছিল এইরকম ঃ তারকাটি ক্ষুদ্র হয়ে গেলে পদার্থ কণিকাগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে যায়, সুতরাং পাউলির অপবর্তন নীতি অনুসারে তাদের অবশ্যই একেবারে অন্যরকম গতিবেগ হয়। এই গতিবেগ তাদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে, ফলে তারকাগুলিতে প্রসারণের ঝোঁক দেখা যায়। ঠিক যেমন তারকাটির জীবনের শুরুতে মহাকর্ষের ভারসাম্য রক্ষা করেছিল উত্তাপ, তেমনি মহাকর্ষীয় আক্রমণ এবং অপকর্ষণ নীতিভিত্তিক বিকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষিত হলেই তারকাটি তার নিজস্ব স্থির ব্যাসার্ধ অপরিবর্তিত রাখতে পারে। কিন্তু চন্দ্রশেখর বুঝতে পেরেছিলেন অপবর্তন নীতিভিত্তিক বিকর্ষণের একটি সীমা আছে। অপেক্ষবাদের তত্ত্ব তারকাটির ভিতরকার পদার্থ কণিকাগুলির গতিবেগের পার্থক্যের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়েছে, সে সীমা হল অনেকের দ্রুতি। এর অর্থ হল - তারকাটি যথেষ্ট ঘন হলে অপবর্তন নীতিভিত্তিক বিকর্ষণ মহাকর্ষীয় আকর্ষণের চাইতে কম হবে। চন্দ্রশেখর হিসাব কষে দেখেছিলেন একটি শীতল তারকার ভর সূর্যের ভরের দেড় গুণের চাইতে বেশি হলে সে নিজের মহাকর্ষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এই ভর এখন 'চন্দ্রশেখর সীমা' নামে খ্যাত।

একটি তারকার চুপসে গিয়ে কৃষ্ণগহ্বর গঠন করা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আপনি কী দেখবেন সেটা বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে অপেক্ষবাদে কোনও পরম কালের অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক পর্যবেক্ষকেরই কাল সম্পর্কে তার নিজস্ব মাপন রয়েছে। একটি তারকার উপর অবস্থিত একজন ব্যক্তি সাপেক্ষ কাল দূরে অবস্থিত অংশ একজন ব্যক্তি সাপেক্ষ কালের চাইতে পৃথক হবে। এর কারণ তারকাটির মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র। অনুমান করা যাক একজন সাহসী মহাকাশচারী একটি সংকোচনশীল তারকার পৃষ্ঠে রয়েছে, তারকার সঙ্গে মানুষটিও চুপসে ভিতর দিকে চলে যাচ্ছে, সে নিজের ঘড়ি অনুসারে নিজের মহাকাশযানকে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে সংকেত পাঠাচ্ছে। তার মহাকাশযান তারকাটিকে প্রদক্ষিণ করছে, ধরা যার কোনও এক সময়ে, তার ঘড়ি অনুযায়ী ১১টার সময় তারকাটি প্রান্তিক ব্যাসার্ধের নীচে সংকুচিত হয়ে থাকে, এই অবস্থায় মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে কোন কিছুই সেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না, এবং তার সংকেতগুলিও আর মহাকাশযানে পৌছবে না। ১১টার কাছাকাছি সময়ে মহাকাশযান থেকে আসা তার পর্যবেক্ষণরত সঙ্গীরা দেখতে পাবে মহাকাশচারীর কাছ থেকে আসা ধারাবাহিক সংকেতগুলির অন্তর্বর্তী সময় ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে, কিন্তু ১০ টা বেজে ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড পর্যন্ত এই অভিক্রিয়া হবে অতি অল্প। মহাকাশচারীর প্রেরিত ১০টা ৫৯ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের সংকেত এবং তার নিজের ঘড়িতে যখন ১০ টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড হয়েছে তখনকর প্রেরিত সংকেতের জন্য তার সঙ্গীদের এক সেকেন্ডের মাত্র সামান্য দীর্ঘতর সময় অপেক্ষা করতে হবে। মহাকাশযান থেকে দেখলে মহাকাশচারীর ঘড়ির ১০ টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড এবং ১১টার মধ্যবর্ত্তী সময়ে তারকার পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত আলোকতরঙ্গ অসীম কালপর্ব ছাড়িয়ে বিস্তৃত হবে। ধারাবাহিক তরঙ্গগুলির মহাকাশযানে আগমনের অন্তবর্তী সময় ক্রমিক দীর্ঘতর হবে, সুতরাং তারকা থেকে আগমশীল আলোকত্ত ক্রমশ লাল থেকে আরও বেশি লাল হবে এবং আরও ক্ষীণতর হতে থাকবে শেষ পর্যন্ত তারকাটি এত ক্ষীণপ্রভ হবে যে সেটা আর মহাকাশযান থেকে দেখা যাবে না ঃ অবশিষ্ট থাকবে শুধু স্থানে একটি কৃষ্ণগহ্বর। তারকাটি কিন্তু মহাকাশযানটির উপর অবিরাম একইরকম মহাকর্ষীয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে এবং মহাকাশযানটিও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কৃষ্ণগহ্বর প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

তারকা থেকে যত দূরে যাবেন মহাকর্ষও তত দুর্বল হবে, সুতরাং আমাদের সাহসী মহাকাশচারীর পায়ের উপরকার মহাকর্ষীয় বল মাথার উপরকার মহাকর্ষীয় বলের চাইতে সবসময়ই বেশি হবে। যে প্রান্তিক ব্যাসার্ধে 'ঘটনা দিগন্ত (Event Horizon) সৃষ্টি হয়েছিল তারকাটির সংকুচিত হয়ে সে অবস্থায় পৌঁছনোর আগেই বলের এই পার্থক্য আমাদের মহাকাশচারীকে

টেনে সেমাইয়ের মতো লম্বা করে দেবে নয়তো ছিড়ে ফেলবে। আমাদের কিন্তু বিশ্বাস মহাবিশ্বে ছায়াপথগুলির কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মতো বৃহত্তর বহু বস্তুপিণ্ড রয়েছে, সেগুলিও মহাকর্ষের ফলে চুপসে কৃষ্ণগহ্বর তৈরী করতে পারে, এগুলির মধ্যে কোনও একটির উপরে একজন মহাকাশচারী থাকলে কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হওয়ার আগে সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না। বস্তুত প্রান্তিক ব্যাসার্ধে পৌছালে তার কোন বিশেষ অনুভূতি হবে না, এবং লক্ষ্য না করেই যে বিন্দু থেকে ফেরা যায় না সে বিন্দুও সে অতিক্রম করতে পারে। তবে অঞ্চলটা যখন চুপসে যেতে থাকবে তখন মাত্র কয়েক ঘন্টার ভিতরেই তার পায়ের উপর ও মাথার উপর মহাকর্ষীয় বলের পার্থক্য এত বেশি হবে যে আবার তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে অবস্থিত কোনও পর্যবেক্ষক এই ভবিষ্যৎ বাণী করার অক্ষমতার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, তার কারণ আলোক পিণ্ডরা অন্য কোনও সংকেতই এই অনন্যতা থেকে তার কাছে পৌছাতে পারে না। এই উল্লেখযোগ্য তথ্যই রজার পেনরোজের 'মহাজাগতিক বিধান প্রকল্প' (Cosmic Censonship hypothesis) প্রমতাবের পথিকৃৎ, ঐ কথাই সহজ করে অন্যভাবে বলা যায় - 'ঈশ্বর নিবারণ অনন্যতাকে ঘৃণার সঙ্গে পরিহার করেন'। সে সমস্ত পর্যবেক্ষক কৃষ্ণগহ্বরের বাইরে থাকেন অনন্যতায় ঘটা ভবিষ্যবাণী করার ক্ষমতা ভেঙে পড়ার পরিণতি থেকে তাদের রক্ষা করে এই প্রকল্প, তবে যে মহাকাশচারী গহ্বরে পড়ে যায় হতভাগ্য সে বেচারার জন্য কিন্তু এ প্রকল্প আদৌ কিছু করে না।

কোন বস্তুতলকে আমরা কখন দেখি? ওই বস্তু থেকে যখন আলোক আমাদের চোখে এসে পড়ে। তবে কৃষ্ণগহ্বরকে আমরা সরাসরি দেখতে পাই না, পরোক্ষভাবে তার অস্তিত্ব আমরা প্রমাণ করতে পারি। ধরা যাক, কোন একটি যুগ্ম তারা রয়েছে। তারা দুটি খুব কাছাকাছি। একটি তারার ভিতর যদি সুপারনোভা ঘটে, তা থেকে নানা রকম পদার্থ ছিটকে বেরোবে, একটা কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হবে। কাছের তারাটি থেকে গ্যাস ও ধূলিকণা কৃষ্ণগহ্বরের দিকে আকর্ষিত হবে। তারপর কৃষ্ণগহ্বরের চারপাশে ঘুরতে থাকবে। গ্যাস ক্রমশ ঘনীভূত হলে ঘর্ষণবল বাড়বে এবং গ্যাসীয় অনুগুলির গতিশক্তিও অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে, ধূলিকণার গতিশক্তিও বাড়বে। এই অস্থির আবহ থেকে জন্ম নেয় এক্স-রে (X-Ray)। ইভেন্ট হরাইজন এর চারপাশে যে গ্যাসও ধুলিকণা ঘুরপাক খাচ্ছে তার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'অ্যাক্রেশন ডিস্ক (Accretion Disk)।

যেহেতু, আমরা জানি কৃষ্ণগহ্বরের দিগন্ত থেকে কোনও কিছুই নির্গত হতে পারে না, তাহলে প্রতীয়মান কৃষ্ণগহ্বর থেকে কণিকা নির্গত হওয়া কী করে সম্ভব? উত্তরটি দিচ্ছে কণাবাদী তত্ত্ব (Quantum Physics) - কণিকাগুলি কৃষ্ণগহ্বরের ভিতর থেকে আসে না, আসে কৃষ্ণগহ্বরের দিগন্তের ঠিক বাইরের শূন্য স্থান থেকে। আইনস্টাইনের সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে শক্তি ভরের আনুপাতিক। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরকার অপরাশক্তির স্রোত তার ভর কমিয়ে দেয়। কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমলে তার ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফলও ক্ষুদ্রতর হবে, কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপিক এই হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষতিপূরণ হতে পারে নির্গত বিকিরণের এনট্রপিক দ্বারা এমনকি তার চাইতেও বেশি কিছু সারা, সুতরাং 'দ্বিতীয় বিধি' কখনই লঙিঘত হয় না।

যে সকল তারাদের ভর বেশি, তারাই কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারে। আমাদের সূর্যের ভর কম, তাই সূর্য কখনও কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হতে পারবে না। সূর্যের অভ্যন্তরে নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নানান উপাদান মজুত রয়েছে, সেসব ফুরিয়ে যেতে চারশ কোটি বছর লাগবে। তখন সূর্যের নতুন নাম হবে ' শ্বেত বামন তারা' (White dwarf), যে তারাদের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে অন্তত কুড়িগুণ বেশি হবে। এরা কৃষ্ণগহ্বরে রূপান্তরিত হতে পারবে। কেননা, এদের যখন নিউক্লিয় জ্বালানি ফুরিয়ে আসবে, এরা সংকুচিত হবে। সুপারনোভা ঘটার ফলে কিছু জিনিস এদিক ওদিক ছিটকে যাবে, পড়ে থাকবে শুধু শাঁস। সংক্ষেপে বন্ধ হলে নিউট্রন তারা (Newtron Star) তৈরী হবে। আর সংকোচন বন্ধ না হলে কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হবে।

কৃষ্ণগহ্বর ভিতরকক্ষের উপর যে কৃষ্ণগহ্বরের কথা বলা হল তাকে বলে 'নক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর (Star Black Hole)। এছাড়া রয়েছে 'অতিভর কৃষ্ণগহ্বর (Super Massive Black Hole) ও 'ক্ষুদ্র কৃষ্ণগহ্বর' (Miniature Black Hole)। সকল কৃষ্ণগহ্বর একই উপায়ে তৈরী হয় না। নক্ষত্র কৃষ্ণগহ্বর তৈরীর কথা বলা হয়েছে। অতিভর ক্ষুদ্র গহ্বর কৃষ্ণগহ্বর সাধারণত ছায়ামণ্ডলীতে দেখা যায়। আমাদের সবচেয়ে কাছাকাছি যে অ্যাক্সেকিতা ছায়ামণ্ডলী রয়েছে সেখানেও এখন কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে। কয়েক কোটি সূর্যের ভর নিক্ষিপ্ত হল সে ভর দাঁড়ায়, একটি কৃষ্ণগহ্বর ভর তেমন-ই। ছায়ামন্ডলীর পরিধি

এলাকায় নক্ষত্রগুলি যেহেতু পরস্পরের থেকে দূরে থাকে, সেখানে এখন কৃষ্ণগহ্বর তৈরী হওয়ার সম্ভবনা বেশী।

একটি ছায়া মন্ডলী নাম m87। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা ওই ছায়ামন্ডলীতে কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। এই মহাজাগতিক বস্তুটিতে সূর্যের চেয়ে তিন বিলিয়ন গুণ বেশি ভর রয়েছে। অথচ তার মোট আয়তন শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। আয়তন আমাদের সৌরমন্ডলীর চেয়েও ছোট। সিগনাস x – 1 এক অতিপরিচিত যুগ্ম তারা। বিজ্ঞানীদের নানা কারণেই মনে হচ্ছিল সেখানে কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে। সম্প্রতি একাধিক পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই ধারণার ভিত্তি প্রমাণ দৃঢ়মূল হচ্ছে।

আবার m84 ছায়ামন্ডলীতে এই যন্ত্রে (ITIS) আমাদের এক অতিভর কৃষ্ণগহ্বরের খবর জানিয়েছে। আলোক তরঙ্গের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আবর্তনশীল পদার্থের গতিবেগ সেকেন্ডে চারশো কিলোমিটার। অর্থাৎ ঘন্টায় ১.৪ মিলিয়ন কিলোমিটার। পৃথিবীর গতিবেগ যদি এমনটা হতো, তবে মাত্র সাতাশ দিনে বছর শেষ হয়ে যেত। আমরা কি তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যেতাম?

# জৈব প্রযুক্তি বিজ্ঞানের আলোকে আধুনিক কৃষি

**তন্ময় ঘোষ**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

মানব সভ্যতার বিবর্তনের নিরিখে কৃষির ইতিহাস সুপ্রাচীন, তাই সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথেই কৃষিক্ষেত্রে বিবর্তনের ধারাও সুস্পষ্ট। সভ্যতার আদিলগ্নে মানুষ গাছের ফলমূলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত এবং ছোটখাটো পশুপাখি শিকার করে তাদের কাঁচা মাংস খেত। এরপর তারা ধীরে ধীরে পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখলো এবং ঝলসানো মাংস আর সেদ্ধ শস্যদানা খেতে শুরু করলো এভাবে আস্তে আস্তে তারা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট বসতি স্থাপন করতে শুরু করলো এবং সেই সব বসতি সমাজের মহিলারা অনেক আগাছার মধ্যে খাদ্য যোগ্য শস্যদানার বীজগুলোকে সংগ্রহ করে আলাদা করে জমিতে অধিক পরিমাণে চাষ করা শুরু করলো। ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক ১০,০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে এইভাবে প্রাথমিক কৃষিকাজের সূত্রপাত ঘটে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সভ্যতাগুলোকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সকল সভ্যতাই নদীমাতৃক এবং কৃষিনির্ভর প্রস্তর যুগ অতিক্রম করে মানব সভ্যতার অগ্রগতি যখন ধাতব যুগে (তাম্র-ব্রোঞ্জযুগ, লৌহ যুগ) হয়, তখন কৃষিক্ষেত্রে ধাতব যন্ত্রপাতির আগমনের ফলে প্রভূত উন্নতি ঘটে। এরপর বছরের সব সময় কৃষিকাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের আগমন ঘটে। ঐতিহাসিকদের মতে আজ থেকে প্রায় ৮০০০ বছর আগে (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দে) জলসেচ ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে।

মধ্যযুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ গঠন হয় ফলে বিভিন্ন শস্যাদি আদান প্রদান হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি কৌশল সম্পর্কে সকলে অবহিত হয় যা সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। মধ্যযুগে শেষভাগে আস্তে আস্তে সামগ্রিক বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করে, ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। তাই এই সময় মানুষ শস্যের অধিক ফলনের চেষ্টা করতে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দুটি শস্যের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে অথবা একই শস্যের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সংরায়ণ ঘটিয়ে নতুন অধিক ফলনশীল এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ফসল তৈরী করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের পর সারা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় তার প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আসার সুবাদে কৃষি ব্যবস্থার মান অনেক অংশে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধীরে ধীরে শিল্পের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার পরের দিকে কৃষিক্ষেত্রের গুরুত্ব অনেক অংশে হ্রাস পেতে শুরু করে। অপেক্ষাকৃত বেশি আধুনিক রাষ্ট্রগুলো এই সময় জলপথে বিভিন্ন প্রদেশ আবিষ্কার করতে শুরু করে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের খেলায় মেতে ওঠে এবং শিল্পের প্রসারে মেতে ওঠে। ফলস্বরূপ কৃষি ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে এবং তার সঙ্গে কমতে থাকে। কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যাও। ফলে বিশ্বজুড়ে শুরু হয় চরম খাদ্য সংকট যার পরিণতি শুরু হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বঙ্গপ্রদেশের ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়, ফলে এই সময় বাংলাদেশ জুড়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয় যা লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা আরও বেড়ে যায়। গর্ভকালীন সময়ে সঠিক পুষ্টি না পাওয়ার কারণে প্রচুর বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে শস্যদানা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯.৬ মিলিয়ন টন যা বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের উৎপাদনের ৪০ শতাংশ সামগ্রিক জনসংখ্যার নিরিখে এই উৎপাদন অতীব সামান্য ফলে বিশ্বজুড়ে অনাহারে মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে অনাহারে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের পঞ্চাশের মন্বন্তর ১৯৫৮ -৬১ খ্রিষ্টাব্দের চীনের মহাদুর্ভিক্ষ, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের বায়াফ্রা দুর্ভিক্ষ, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের কাম্বোডিয়া দুর্ভিক্ষ, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের উত্তর কোরিয়ার দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ইথোপিয়ার দুর্ভিক্ষ সমগ্র

বিশ্বের মানবসভ্যতাকে নাড়িয়ে দেয়। এই সময় উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে শস্যের গুণগত মান অনেক অংশে নীচে নেমে যায়। বিশ্ব কৃষি ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশ্বের প্রখ্যাত কৃষিবিদেরা তৎপর হন।

১৯৫০-৬০ খ্রিষ্টাব্দে কৃষিবিজ্ঞানী নরম্যান বোরল্যাগের নেতৃত্বে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগে তাদের প্রদর্শিত নিয়মে কৃষিকাজ চালিয়ে মেক্সিকোতে কৃষি ব্যবস্থার অভাবনীয় পরিবর্তন আসে তাই তাদের সৃষ্ট নতুন কৃষি ব্যবস্থার রূপরেখাকে সবুজ বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়। সবুজ বিপ্লবের জনক নরম্যান বোরল্যাগ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান ধীরে ধীরে তাদের প্রদর্শিত পথে বিভিন্ন দেশে কৃষি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয় ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং জেনেটিসিস্টএম.এস. স্বামীনাথনের দ্বারা। ভারতবর্ষের এই নতুন কৃষি কৌশলে যে সকল ব্যাপারগুলির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল- উচ্চফলনশীল বীজের ব্যববার, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কীটনাশকের ব্যবহার, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বহুফসলী চাষ, ফসল প্রক্রিয়াকরণ, শস্য সংরক্ষণ ও বিপননের সুযোগ এবং দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান নতুন কৃষি কৌশলের প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের উৎপাদন হার সবচেয়ে বেশি (১৯৬০-৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মিলিয়ন টন থেকে ২০১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে ৯৬.৬ মিলিয়ন টন) হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন এই অভূতপূর্ব সাফল্য নতুন কৃষি কৌশলেরই ফসল। এছাড়াও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং বহুফসলী চাষের ফলে কৃষি ব্যবস্থা অনেক লাভজনক হয় এবং রাসায়ানিক সারের ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কীটনাশকের ব্যবহার ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পের দূরত্ব অনেক অংশে কমিয়ে দেয়। দরিদ্র কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বহু মানুষ কৃষিকাজের প্রতি আকৃষ্ট হল।

বর্তমানে ভারত কৃষি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ২০০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী, দেশের জিডিপিতে কৃষি এবং বণবিদ্যা, কাষ্ঠ শিল্প ইত্যাদি কৃষি-সহায়ক ক্ষেত্রগুলির অবদান ১৬.৬ শতাংশ। ভারতের মোট শ্রমশক্তির ৫২ শতাংশই এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত। জিডিপিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান বর্তমানে অনেকটা কমলেও, এই ক্ষেত্র আজও ভারতের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং দেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী দুগ্ধ, কাজুবাদাম, নারকেল, চা, পাট, আদা, হরিদ্রা ও কালো মরিচ, আম, লেবু, পেঁপে, ফুলকপি উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে প্রথম। কফি উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে ষষ্ঠ। গম, ধান, আখ, চিনাবাদাম, পেঁয়াজ উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ফলের ১০ শতাংশ ভারতে উৎপাদিত হয় কলা ও সাপোটা উৎপাদনে ভারতের স্থান বিশ্বে প্রথম। তবুও ভারতে ধান ও গম উৎপাদনে ক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি শুধু ভারতবর্ষেই নয় এখন সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা। খাদ্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেলেও তার চেয়েও অনেক বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। যার ফলে বাসস্থানের অভাব দূর করতে ক্রমশঃ কৃষিজমি, অগভীর জলাভূমি এবং বনভূমির ওপরে কোপ পড়েছে। তাই কৃষিজমির পরিমাণ দিন দিন সীমিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় চাহিদাপূরণের জন্য একই জমিতে বছরে ৪ বার চাষ করতে হচ্ছে না শস্যের গুণগত মানের অবনতি ঘটাচ্ছে। অনেক সময় কৃষকরা অধিক ফলনের আশায় অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার, কীটনাশক জমিতে প্রয়োগ করছে ফলে উৎপাদিত ফসল বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। সেই বিষাক্ত ফসল, শাক সবজি, ফলমূল খেয়ে মানুষের শরীরে ক্যান্সারের মত রোগের প্রকোপ বাড়ছে যা মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই সব মারাত্মক সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে তাই বর্তমান কৃষি ধীরে ধীরে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা কী? আসলে এটি জীববিদ্যার অপেক্ষাকৃত নবীন সংযোজন যার মাধ্যমে জীব বা জৈব উপাদানকে প্রযুক্তির কাজে লাগানো হয়। বিশেষত অনুজীব বা মাইক্রোঅরগানিজম দেরকে জৈবপ্রযুক্তির কাজে লাগানো হয়। এখন মনে হতে পারে অনুজীবকে কি করে কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমরা সকলেই জানি শস্যের রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবদের ধ্বংস করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক দেওয়া হয়, যা বেশিরভাগ সময় শস্যের মধ্যেই সংবন্ধন হয় এবং খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং এর বিষক্রিয়া ভয়ঙ্কর রোগব্যাধির সৃষ্টি করে। এছাড়াও জমিতে পরে থাকা অতিরিক্ত

কীটনাশক মাটিতে অবস্থিত সহায়ককারী অনুজীবদেরও মেরে ফেলে ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায় এবং বৃষ্টির জলে সেই কীটনাশক ধুয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে পরে জলদূষণ ঘটায়। কিন্তু ফসলের কোন ক্ষতি সাধন করে না। এই ভাবে সাহায্যকারী অনুজীবের মাধ্যমে রোগসৃষ্টিকারী অনুজীব এবং কীটনাশক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে জৈব নিয়ন্ত্রণ বলে। এর ফলে কীটনাশকের ভয়াবহ বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরূপ জৈব নিয়ন্ত্রণের একটি উদাহরণ হল ট্রাইকোডারমা প্রজাতি নামক একটি ছত্রাক যা ধান, গম, বার্লি, জোয়ার প্রভৃতি শস্যের রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাক অনুজীবকে ধ্বংস করে ফলে বিষাক্ত কীটনাশকের মারাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এছাড়াও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেও রোগজীবাণু এবং ক্ষতিকারক কীটপটঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায় এই পদ্ধতিতে পলিহাউস বা গ্রীণ হাউসের মধ্যে ফসলের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে অর্থাৎ সূর্যালোক, জলের পরিমাণ, উষ্ণতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের ধ্বংস করা যায় এই পদ্ধতিতে ফসলের গুণগত মান ও অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় এবং ফসল বাইরের ক্ষেতের চেয়ে অধিক মাত্রায় ফলন দেয়। এই পদ্ধতির অপর একটি সুবিধা হল এই পদ্ধতি মরশুমের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ যে কোনও মরশুমের ফসল যে কোন সময়ে চাষ করা যায়। বিদেশি ফসল এবং ফলসমূহ এই পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করে প্রচুর উপার্জন করা যায়। জৈবসারের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জৈব বর্জ্য পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ এবং ভারমিকম্পোস্ট ইউনিট তৈরী সবটাই জৈবপ্রযুক্তিবিজ্ঞানের দান।

এছাড়াও কলাপালনবিদ্যার মাধ্যমে ল্যাবরেটরি পরিবেশে একটি কাঁচের পাত্রে একটি মাতৃ উদ্ভিদ বা তার একটি অংশ বিশেষ থেকে খুব কম সময়ে অধিক পরিমাণে চারাগাছ তৈরী সম্ভব হচ্ছে এবং সেইসব চারাগাছের গুণগত মান এবং ফলন ক্ষমতা হুবহু মাতৃ উদ্ভিদের ন্যায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও কলাপালনজাত গাছগুলি সাধারণত খুব কম সময়ে এবং অধিক মাত্রায় ফলন দিতে সক্ষম হচ্ছে। কলা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল উদ্ভিদের উচ্চফলনশীলতার জন্য দায়ী জিনসমূহকে আলাদা করে একই প্রজাতি নিম্নফলনশীল কিন্তু উচ্চরোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে ট্রান্সফার করা হচ্ছে যার ফলে উদ্ভিদে দুটো ক্ষমতাই একসাথে পাওয়া যাচ্ছে এবং তথাকথিত ব্রিডিং পদ্ধতি থেকে অনেক বেশি হারে ফলন দিচ্ছে। এই ধরনের ফসলকে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ক্রপ বা জিএমও ফসল বলে। তাছাড়া তথাকথিত ব্রিডিং পদ্ধতিতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনগুলি ছাড়াও অনেক আনুসঙ্গিক জিন অপত্য উদ্ভিদে পাওয়া যায় যা অনেক সময় ফসলের গুণগত মানকে নিচে নামিয়ে দেয়। কিন্তু জি এমও পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসলের প্রয়োজনীয় জিনই এক বা একের বেশী সংখ্যায় থাকে যা ফসলের গুণগত মানকে অনেক অংশে বৃদ্ধি করে।

এছাড়াও কার্বাইডের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে রাইপেনিং চেম্বারের মাধ্যমে ফল পাকানো সব কিছুতেই জৈবপ্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। সবদিক থেকে বলা যায় বর্তমান কৃষি অনেক অর্থেই প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি নির্ভর। প্রথম বিশ্বের দেশগুলি জৈবপ্রযুক্তি বিদ্যাকে কৃষির সাথে অনেকটাই জুড়ে ফেলতে পারলেও ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এখন পর্যন্ত জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যায় কৌশলগুলি গবেষণা পর্যায়েই রয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সহ সমগ্র বিশ্বে জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার হাত ধরে নতুন কৃষিবিপ্লবের আগমন হবে।

# রহস্যময় কণা গ্র্যাভিটন

**ইন্দ্রনীল মজুমদার**
**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

৪ঠা জুলাই ২০১২।

বিজ্ঞান ইতিহাসের এমনকি মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন কেননা সেদিন বিশ্বের অন্যতম সেরা গবেষণা পীঠস্থান সার্ন (CERN) এর বিজ্ঞানীরা 'হিগস বোসন (Higgs Boson) -কে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই হিগস বোসনের অপর নাম 'হিগস কণা (Higgs particle)'। একে শ্রদ্ধার সাথে 'ঈশ্বর কণা (God Particle)' নামেও ডাকা হয়। এই হিগস বোসন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই কণাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ বা বস্তুকে ভর (Mass) জোগায়। অর্থাৎ এই যে আমরা, সামনে রাখা বই-পত্তর, টেবিল চেয়ার, আলমারি, টিভি, কম্পিউটার, গ্লাসে রাখা জল, যে বাতাস অনবরত নিচ্ছি ও ছাড়ছি, এই পৃথিবী, চাঁদ, গ্রহ, সূর্য এছাড়া মহাকাশে অবস্থিত অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, তারা সহ বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু ইত্যাদি চারপাশের সমস্ত দৃশ্যত এমনকি যাদের দেখা যায় না সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুদেরও অস্তিত্ব থাকত না এই হিগস বোসন ছাড়া। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, হিগস বোসন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভাগ্যিস, এই মৌলিক কণাটিকে কষ্ট করে খুঁজে পাওয়া গেছে, নয়তো আমরা বিশ্বব্রহ্মান্ডের ভরদাতাকে ভালোভাবে জানতেই পারতাম না। তবে, হিগস বোসনকে পাওয়ার পরেও কণা পদার্থবিদ্যা (Particle Physics) তথা বিজ্ঞান কিন্তু সন্তুষ্টিতে বসে নেই। এমনিতেও, বিজ্ঞানে সন্তোষের জায়গা নেই। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে আগের গবেষণায় উঠে আসা পরীক্ষার ফলকে পরম সত্য বলে না মেনে সেটাকে বারবার যাচাই করতে করতে এক পরম সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। এভাবেই চলে বিজ্ঞান। নয়তো, বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা পদার্থবিদ্যা উপশাখা কণা পদার্থ বিদ্যার এত অগ্রগতি হত কি যদি আমরা প্রতিটা পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনকে মৌলিক কণা হিসেবে ধরে নিয়ে বসে থাকতাম? বিজ্ঞান এদেরও ভেঙে এদের যারা গড়েছে সেইসব মৌলিক কণাদের খুঁজে বের করেছে এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আরও কণার সন্ধান চালিয়ে কণা পদার্থবিদ্যাকে আরও সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। এই সমৃদ্ধশালী করার কাজ যুগে যুগে কণা পদার্থবিদরা করে চলেছেন। আচ্ছা এইবার আসি মূল কথায়। কণা পদার্থবিদদের মূল দুঃখটা কোথায়?

আমরা সবাই জানি যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটা বস্তুই অন্য সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণকে বলে মহাকর্ষ (gravitation)। আর এই মহাকর্ষের আকর্ষণটা যদি এই পৃথিবী কিংবা অন্য কোনো গ্রহ, উপগ্রহের উপরে অথবা তাদের কাছাকাছি থাকা অন্য কোন অন্য কোন বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষজনিত যে টান বা বল যা এরা দেয় নিজেদের কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে বলে অভিকর্ষ (gravity)। এই বিষয়ে আবার আসছি তার আগে জেনে নিই প্রমিত মডেল (Standard Model) - এর ব্যাপারে। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতগুলো মৌলিক কণা আছে তারা সবাই ঠাঁই পেয়েছে এই মডেলে। এই মডেল থেকেই বোঝা যায় কোন কণার কি চরিত্র, তারা কোন কাজে লাগে। এই মডেলকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে রয়েছে কিছু মৌলিক কণা যারা সমগ্র পদার্থ বা বস্তু (matte) গঠনের কাজটা করে। ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি (১৯০১ - ১৯৫৪) -র নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে ফার্মিয়ন (Fermion)। এই সব ফার্মিয়ানরা যে পরিসংখ্যান মেনে চলে তা হল ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান (Fermi-Dirac Statistics)। আরেক ভাগে রয়েছে কিছু মৌলিক কণা যারা মহাবিশ্বের তিনটি মৌলিক বল ( Fundamental Interactions বা Fundamental forces ) দের বাহক হিসেবে কাজ করে ও ভর জুগিয়ে থাকে। ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪ - ১৯৭৪)-র নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে বোসন (Boson)। এই বলের বাহকদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় বলের বাহক হল ফোটন, সবল নিউক্লিয় বল বা সবল বলের বাহক হল গ্লুয়ন, দুর্বল নিউক্লিয় বল বা দুর্বল বলের বাহক হল W এবং Z বোসন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বলের বাহক বোসনগুলোকে আমরা গেজ বোসন (Gauge Boson) বলা হয়। এদের নির্দিষ্ট দিক (direction) রয়েছে। আর

ভর জোগায় যে হিগস বোসন (যাকে নিয়ে আমরা শুরুতে আলোচনা করেছি), তাকে স্কেলার বোসন (Scalar Boson) এর অন্তর্ভুক্ত। এই স্কেলার বোসনরা দিকহীন (directionless)। এই তিনটি মৌলিক বলগুলোর সবারই বাহক মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে শুধু একটি বাদে। সে প্রসঙ্গে এবার আসছি।

উল্লেখিত তিনটি মৌলিক বল ছাড়াও আরও একটি মৌলিক বল আছে তা হল মহাকর্ষ (gravity)। এই মহাকর্ষের বাহকের নাম দেওয়া হয়েছে গ্র্যাভিটন (Graviton)। এর প্রতীক G। মনে করা হয় যে, এর ভর শূন্য ও এটি একটি আধানহীন (Chargeless) মৌলিক কণা। আমরা ভর জোগানোর মৌলিক কণা পেয়েছি কিন্তু ভরের সাথে যার নিবিড় আনুপাতিক সম্পর্ক সেই মহাকর্ষের বাহক মৌলিক কণা আমরা এখনো পাইনি। অথচ, আমরা মাটিতে পড়েছি, হাঁটা চলাফেরা করছি, কোনো কিছু ছুড়লে সেটা মাটিতে পড়ে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ও তার আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা ঘটছে, অন্যান্য উপগ্রহরাও মহাকর্ষ বলের ফলে তাদের গ্রহের চারপাশে ঘুরছে এছাড়া আরও ইত্যাদি যেসব মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের ঘটনা ঘটছে সেই সকলের মূলে থাকা মৌলিক কণা গ্র্যাভিটনকে কি খুঁজতে হবে না? অবশ্যই খোঁজা দরকার। পদার্থবিদ গিয়া দ্বাওয়ানি ও সিজার গোমেজ মনে করেন যে, কৃষ্ণগহ্বরগুলো (Black Holes) যেন গ্র্যাভিটন ভর্তি বালতি। এই কৃষ্ণগহ্বর মহাবিশ্বের এমন একটি জায়গা যেখানে মহাকর্ষ বল এতোই বেশি যে আলোও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

যদি কণা পদার্থ বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান গ্র্যাভিটনের দর্শনলাভ করে তবে আমরা চারটে মৌলিক বলের বাহক মৌলিক কণাদেরকেই খুঁজে পাব। এখন সবকিছু আকর্ষণ করার মূলে থাকা এই মৌলিক কণাকে খোঁজার অপেক্ষা।

# বহমান

**প্রসেনজিৎ মন্ডল**
**অধ্যাপক**
**রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব এডুকেশন**

অভিরূপ এখন পঁয়ত্রিশ। আর দশটা পাঁচটা ছাপোষা বাঙালি নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা ঠিক যেমন ভাবে বেড়ে ওঠে তার বেড়ে ওঠাও ঠিক তেমনই। একটা বয়স ছিল যখন অভিরূপ মৃত্যুর তেমন কোনো অর্থ বুঝত না, নানান উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল যেমন মারা যায় - বেঁচে থাকে, সেইটুকু মাত্র। অনুভূতিটা শতাংশের হারে এখনকার তুলনায় নগণ্য বা যৎসামান্য বলা যেতে পারে। একবার মারা গেলে সে যে আর ফিরে আসে না এই অনুভূতিটা ওই সময় তেমন একটা ছিল না। সময় ও ঘড়ির মূল্য খুব একটা আঁচ করতে পারত না, ছোট্ট অভিরূপের শৈশবে দুঃখ বলতে বড়োরা মারলে, বকলে, কারো সাথে মন কষাকষি ও শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, ওই সময় মনের ভিতরে সবথেকে বেশি করে যা কাজ করতো তা হল শারীরিকভাবে বা আকারে বড় হবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কিভাবে অন্যের থেকে শারীরিকভাবে আরো বেশি করে শক্তিশালী হওয়া যায়, ও অন্যদের কিভাবে নিজের কথার অনুসারী করা যায় সেটাই। মনের ভিতর এই ভাবনাটাই দানা বেঁধেছিল যে বড় হলে বুঝি আর কোনো সমস্যা থাকবে না, বাড়ির বড়রা যেমন যেখানে খুশি যেতে পারে, খুশিমতো যা ইচ্ছা করতে পারে, তেমনটা কেন তার বেলাতেও হবে না? ছোটদের বেলাতেই শুধুমাত্র কেন প্রত্যেক কথাতেই 'না' এর উল্লেখ হবে? সত্যি বলতে ওই সময়টাতে তার নিজেকে খুবই পরাধীন বলে মনে হত। নিজের পাশাপাশি অন্য শিশুদের কথা ভেবেও তার মনে এর জন্য যথেষ্ট ব্যথা অনুভূত হত। কেবলই তার মনে হত ওই পারে ঈশ্বর সব সুখ-ই শুধুমাত্র বড়দের জন্য রেখে দিয়েছেন। অভিরূপ তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যখন সে প্রথম শ্রেণিতে পড়তো তখন সেই শ্রেণির জন্য আলাদা কোন ঘর বরাদ্দ না থাকায় গাছের নিচে ক্লাস হত। আর অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণির জন্য অর্থাৎ তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির জন্য আলাদা দালানঘর বরাদ্দ ছিল। তখন গাছের তলায় ক্লাস তার একেবারেই ভাল লাগত না। আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান বোধ অতটা ভাল করে না বুঝলেও দালান ঘরে স্থান না পাওয়ার যন্ত্রণাটা তাকে সব সময় বিদ্ধ করত, তবে একটা ব্যাপারে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিত এবং মনকে আশ্বস্ত করত এটা বুঝিয়ে যে, গাছের তলায়-ই হোক আর দালান ঘরেই হোক সবাইকে তো ওই চাটাই বা সিমেন্টের পুরনো বস্তা গ্রাম্য পরিভাষায় 'ছালা'তেই বসতে হয়,ওই একটা ব্যাপারে তো অন্ততঃ ছোট-বড় সবাই এক, যদিও বর্তমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে এর চল প্রায় উঠেই গেছে এবং ব্যাপারটাকে তখন তার বেশ গণতান্ত্রিক বলেই মনে হত। অভিরূপ নিয়মিত স্বপ্ন দেখতো সেও একদিন দালান ঘরে বসবে এবং সেখানে বসে ওই গাছ তলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসবে। এই যে দেখো আমি তোমাদের থেকে কতই না বড় এবং ভালো আছি।

অভিরূপ যখন বাড়ির পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, সে যেন এক নতুন পৃথিবী, অন্য এক জগৎ, এটা ভেবেই সে অবাক হত যে শুধুমাত্র বয়সের কারণেই সে এতদিন এতকিছুর থেকে বঞ্চিত ছিল। মনে মনে ভারি আফসোস যে বড্ড দেরী হয়ে গেল। তখন সে একটু একটু সময়ের মূল্য বুঝতে পারছে, আহা, ঘড়িটা বড্ড বেশিই জোরে ছুটছে, এই ভাবটা কেমন যেন মনে আসতে শুরু করেছে। ছুটির দিনগুলিকে খানিকটা মরীচিকার মত মনে হত। কিন্তু প্রাথমিক পেরিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে আবারও সেই একই অনুভূতি মনের ভিতর, পঞ্চম থেকে অষ্টম, নবম, দশম কতই না ভালো আর একাদশ-দ্বাদশ সে তো স্বপ্নের মত! অনেক সময় তাঁর মনে হতো বিদ্যালয়ের সমস্ত ভালো ব্যবস্থা গুলো যেমন খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করা সবই উঁচু শ্রেণির জন্য বরাদ্দকৃত। তবে কিছু ব্যাপারে এখন সে অনেকটাই বড় এবং নিজেকে আশ্বস্ত করে এটা বুঝিয়ে যে এখন তার অনেক বন্ধু এবং নিজে এখন একা একা অনেকটা দূর

পাড়ি দিতে পারে। পঞ্চম পেরিয়ে যখন এক এক করে দশম উত্তীর্ণ হল এবং একাদশে ভর্তি হল। এই জীবন যেন এক অসম্ভব চরম উন্মাদনায় ভরা, অন্য এক অপার স্বাদ, এ জীবন যেন কোন কিছুর বাঁধ না মানার, এর জন্যই তো এত দিনের অপেক্ষা, এত আকুতি মিনতি, কান্না, চেপে থাকা নিজেকে দমিয়ে রাখা, কী চরম সে সুখানুভুতি অন্যরকম মত্ততায় মুগ্ধতায় ভরা, জীবনের সব প্রার্থনা যেন এই সময়টা বা এই বয়সটির জন্যই, এ যেন হাওয়ার অনুকূলে চঞ্চল বেগে ধাবমান পালতোলা এক নৌকা। এখন আর অভিরূপকে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে সেভাবে কাউকে বলে বেরোতে হয়না, কোন কাজ করতে চাইলে সবার অনুমতি নিতে হয় না, ঘরে বাইরে সর্বত্রই সবাই তাকে সমীহ করে না চললেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। প্রতিটা দিনেই সে কেমন যেন একটা একটা করে নিয়ম, শৃঙ্খলা, কাঁটাতার, বেড়া, গণ্ডি পার করার ও ভাঙার শপথ নিয়েছে, যার স্বপ্ন সে এতদিন ধরে দেখে আসছিল। অভিরূপ এখন কেমন যেন কৈশোরের মন্ত্রে মুগ্ধ এক উপাসক। দিনগুলি বেশ কাটছিল অভিরূপের কিন্তু জীবনের তথাকথিত সময়ের ছন্দপতন বলে একটা ব্যাপার এসেই যায়, এবং সেই ছন্দপতন ঘটে দ্বাদশ পরীক্ষার ফলাফলে। ছন্দ পতনের কারণগুলি এক এক করে অনুধাবন করলেও পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা যে এই ফলাফলের কোন পরিবর্তন করবে না তা সে ভালোভাবে বুঝতে পারে। জীবনের খাতা থেকে সুখের দিনগুলি দ্রুত বিয়োগ হতে থাকে। খানিকটা দিশেহারা নিরুপায় ভগ্নহৃদয়ে দিন কাটতে থাকে। নিজেকে সে বার বার প্রশ্ন করতে থাকে এর কারণটা কি সে আগে থেকে জানতো না! নাহ! সে তো সবই জানতো, এমনটাই তো হওয়ারই ছিল, তাহলে এখন এত অনুশোচনা কিসের? অভিরূপ তো সেই কিশোর হতে চেয়েছিল যে কিশোরের গল্প অনুপ্রেরণা যোগায় যে কিশোর সবার ভালবাসা পায়, তবে সব উল্টোটা কেন হল? এখন অভিরূপ আর বড় হতে চায় না, মনে মনে সে সর্বদা শৈশবের জয়গান গায়! প্রার্থনা, আকুতি চেষ্টা কোন কিছুতেই যে আর শৈশবে ফেরা সম্ভব নয় সেটা অভিরূপ ভালোভাবেই বুঝতে পারে, বার বার করে মনে হয় কেনই বা বড় হতে গেলাম কেনই বা বড় হলাম, এখন আর আগের মতে করে বড় হতে ইচ্ছা করে না অভিরূপের। এখন জীবনের অনেকগুলো বছর, অনেকগুলো দিন কেটে গেছে অভিরূপের, জীবনে মোটামুটি ভাবে প্রতিষ্ঠিত এখন নিম্নবিত্ত থেকে সে নিম্ন মধ্যবিত্ত। দিনের সাথে সাথে জীবনও এগোচ্ছে। অভিরূপ এখন জানে যে জীবনে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আবেগ, অনুযোগ কিংবা অভিযোগ-কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। ঘড়ির কাঁটা থেমে নেই, প্রতিটি মুহূর্তেই জীবন থেকে একটি একটি করে সেকেন্ড হারিয়ে যাচ্ছে তার। সবাই দ্রুত সামনে এগোনোর প্রহর গুনছে, সবশেষে তার মনে হতে থাকে গতকালের সেই গাছের নিচের ক্লাস, উনুনের ভেতর লুকিয়ে রাখা মার্বেল, ডাংগুলি, কাঁকড়ার গর্ত, চাষীর ধান ও বাদাম তোলার শেষে বস্তা নিয়ে অবশিষ্টাংশে খুঁজতে যাওয়া, তার সেই ছোট্ট ক্যাপ্টেন সাইকেলটা, ছোট্ট চোখে জানালার বাইরে কচুবনে বৃষ্টি দেখা, একই আকাশ একই বাতাস কিন্তু অভিরূপ এবং অভিরূপের চারপাশটা আজ সম্পূর্ণই আলাদা, অন্য মত্ততা মাদকতায় ভরা।

# শোক

**আকাশ রঞ্জন দে**

**ছাত্র, বি.এড (দ্বিতীয় বর্ষ)**

মানব জীবনে অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। মানুষ কতই না প্রত্যক্ষ ঘটনাকে মনন গহ্বরে জমিয়ে রেখে সমুদ্র সম অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার গড়ে তোলে। সেই ভাণ্ডারের কোন এক ছোট্ট স্থান থেকে একটি কাহিনী আজ বলবো, যা সমাজের এক বর্বরতাকে সবার সামনে উন্মোচন করবে হয়তো।

গ্রামের নাম কমলপুর, সাধারণ জনজীবন, খেটে খাওয়া মানুষের এক ভালোবাসার গ্রাম। এই গ্রামের দিন শুরু হয় মোরগের উচ্ছ্বসিত ডাক আর গোরুর গাড়ির ঘড়ঘড়ানি দিয়ে। গ্রামের মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা একে অপরের প্রতি থাকলেও এখানে মানুষের মনের এক বৃহত্তর নগ্ন মানবিকতা কখনো কাজ করে। আজ সেই নগ্নতার একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরব। গ্রামের আর পাঁচজন শ্রমিজীবি মানুষের মত শংকর বৈরাগীও একজন ছাপোষা মানুষ। তার ঘরে দিন চলে সবজি বিক্রি করে। এই অভাবের সংসারে তাঁর সঙ্গী স্ত্রী উমা দেবী আর পাঁচ বছরের ছেলে তরুণ। একটি ছোট্ট পাঠশালায় বহু কষ্টে চলত তরুণের পড়াশোনা। গ্রামের সকলেই ভালোবাসত এই পরিবারকে। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন কোথাও তাদের ভাগ্যে অন্যভাবেই কলম চালিয়ে ছিলেন। এক বৃহস্পতিবারের সকালে নেমে আসে এই পরিবারের ওপর সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান শংকর বৈরাগী। পুরো পরিবার সহ গ্রাম জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। গ্রামের প্রত্যেকে সেদিন আসে উমা দেবীকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু এই চরম বাস্তবের কঠোর আঘাতের কাছে সেই সান্ত্বনা জড় বস্তুর মতোই প্রাণহীন। কেউ কেউ সান্ত্বনা স্বরূপ বলে ওঠেন যে, - যে যাওয়ার সে তো সুখেই চলে গেছে, কিন্তু এদের কী হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এখানে যে চলে যাচ্ছে সে কী সুখে যেতে পারে? এই প্রশ্ন আমার সবার কাছে। যাই হোক, এই ঘটনার পরে উমা দেবী পাঁচ বছরের তরুণকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সত্যিই কি নতুন ভাবে বাঁচা যায়। নাকি বেঁচে থাকার জন্য নতুন লড়াই শুরু করতে হয়? এখান থেকেই শুরু হয় এক বিচিত্র লড়াই। এই যুদ্ধে এক পক্ষে কেবল উমা দেবী ও তাঁর সন্তান। আর অপর পক্ষে এই সমাজ। এখন উমা দেবীর জীবনে কেবল একটি চাওয়া। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করবেন। এই লক্ষ্যেই তিনি স্বামীর সবজি দোকানের হাল ধরেন। আর তখনই শুরু হয় গ্রামের মানুষের হীন মানসিকতা। উমা দেবীর উপর শুরু হয় মানসিক অত্যাচার। এই অত্যাচার পারিবারিক ছিল না। ছিল সামাজিক। প্রথমত একজন নারীর বাজারে বসে জিনিস বিক্রি করা মেনে নেয়নি গ্রামের সমাজ। তাদের প্রশ্ন ছিল কি দরকার ছেলেকে পড়াশোনা শেখানোর? তার চেয়ে কাজে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু মা হিসেবে কি করেই বা তা পারতেন উমা দেবী! তিনি তো চান তার ছেলে মানুষের মত মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাক। আর তিনি এও জানতেন এই সমাজের নারকীয় কীট গুলি তা কখনও চায় না। উমা দেবী এসব বিষয়ে কর্ণপাত না করে তিনি তার লক্ষ্য পূরণের জন্য এগিয়ে যান তার তরুণকে নিয়ে। ঈশ্বরের কঠিন বিচার কাউকে শূন্যতার মাঝে ফেলে দিলেও একটি বিশেষ শক্তির জন্ম দিয়ে যায় তাকে, সেই শক্তিই ব্যক্তিকে বাঁচতে শেখায় লড়াই করতে শেখায়। সেই শক্তি হল সহ্য ক্ষমতা। পাঁচ বছরের সেই ছোট্ট তরুণ এই পরিস্থিতিতে এটুকু ভালো মতোই বুঝেছিল যে তার জীবন এখন একটি পাতলা সুতোর উপর দাঁড়িয়ে। তাই সে তার মা এর ইচ্ছে মতোই চলতে শুরু করে নিজের সব ইচ্ছেকে বিদায় জানিয়ে। তারপর কেটে গেছে দশ বছর। এখন তরুণ ছাত্র হিসেবে উচ্চ বিদ্যালয়ে সবার প্রিয়। বিদ্যালয়ে প্রথম পর্ষদের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় তরুণ। উমা দেবী হয়তো সেদিন আবার ছেলের জন্য শুধু গর্ব বোধ করেননি, বহু বছর পর আনন্দে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুক হালকা করেছিলেন। তরুণের পড়াশোনা এভাবেই সমান তালে এগিয়ে চললো। এর ঠিক দুই বছর পর ঈশ্বরের আবার কঠোর আঘাত এসে পড়লো তরুণের জীবনে। উমা দেবী এক সোমবারের সকালে বাজারে তাঁর দোকানে বসে কাজ করছিলেন, হঠাৎ তিনি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন এবং সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তরুণ তখন স্কুলে, গ্রামের কিছু লোক ধরাধরি করে কাছেই গ্রামের

**শোক** আকাশ রঞ্জন দে

হাসপাতালে নিয়ে যায় উমা দেবীকে, তরুণের স্কুলে খবর গেলে ছুটে আসে তরুণ। ওই বছর ছিল তরুণের স্কুল পাশের অন্তিম পরীক্ষা। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি পরীক্ষা করা হয় উমাদেবীর। ধরা পড়ে ব্লাড ক্যানসার। কোনো এক মানসিক ক্ষমতা বলে উমাদেবী এইরকম কিছু অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলেন। তাই পরীক্ষার পূর্বে তিনি ডাক্তারকে বলেন ফল যাই আসুক তা যেন তার ছেলের কানে না যায়। হলও তাই, ডাক্তারবাবু তরুণকে বলেন,পরিশ্রম বেশী হওয়ার জন্য তার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে। কিছুদিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তরুণ তাই বিশ্বাস করে কিছুদিন পর তাঁর মাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এরপর তিন মাস কেটে যায়। শুরু হয় তরুণের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। উমাদেবীর স্বাস্থ্য দিনের পর দিন আরো ভেঙে পড়ে। তিনি কখনই চাননি তরুণ এইসব জানতে পেরে পড়াশোনা ছেড়ে দিক এতো দূর এসে। স্কুল ফাইনালের একদিন রেজাল্ট এল, সাফল্যের সঙ্গে উর্ত্তীণ হয় তরুণ। উমাদেবী এই খবরে যেন জীবনের নতুন করে প্রাণ ফিরে পান। কিন্তু সেই প্রাণ হয়তো মনেই প্রভাব ফেলেছিল, শরীর হয়তো তা মেনে নেয়নি। দিনের পর দিন তিনি আরো অসুস্থ হতে থাকেন। তরুণ বুঝতে পারে তার মা কোনো এক কারণে ধীরে ধীরে অবশ হয়ে পড়েছে। এরপর দিন মাস কেটে যায়। তরুণ এখন কলেজ পাশ করে একটি ব্যাঙ্ক এর উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিন্তু আজ উমাদেবী জীবনের শেষ পর্যায়ে। তবুও তাঁর মুখে একটি নির্মল হাসি, চোখে আনন্দের ধারা। তাঁর এক মাত্র সন্তান আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এটাইতো চেয়েছিলেন তিনি। ডাক্তার বাবু দেখতে এলেন উমাদেবীকে। তিনি এখন শুয়ে হাসপাতালের বিছানায়। ডাক্তারবাবু তরুণকে বলেন সূর্য ডোবার অপেক্ষা মাত্র। আর সময় নেই। তরুণ ভেঙে পড়ে সম্পূর্ণ রূপে। মা-এর দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। উমাদেবীও হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকেন ছেলেকে। জীবনে শেষবার হয়তো ছেলেকে বলবেন, 'বাবা কাঁদিস না, তোর মা সব সময় তোর সাথে থাকবে', কিন্তু আওয়াজ বেরোয় না গলা দিয়ে। হঠাৎ তরুণের গালে রাখা উমাদেবীর হাতটি নীচে পড়ে যায়, বাইরের সূর্যও অস্ত গেল।

চিরতরে চলে গেলেন উমাদেবী। তাঁর জীবনের শত কষ্টকে লুকিয়ে রেখে তাঁর সন্তানকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন সমাজে। এই প্রত্যক্ষ ঘটনাটি গল্পের মতোই লাগে। গল্প তো প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকেই আসে।

# শিকার প্রসঙ্গ

**কৌশিক বিশ্বাস**

**ছাত্র, বি.এড. (দ্বিতীয় বর্ষ)**

শিকার কথাটার সঙ্গে সকলেই কমবেশী পরিচিত। প্রাচীনকাল থেকে কখনও খাদ্যের প্রয়োজনে কখনও বা আত্মরক্ষার তাগিদে কখনও বা বিনোদনের জন্য শিকার করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বন্যপ্রাণী হত্যা আইন করে বন্ধ করায় শিকারে কিছুটা হ্রাস টানা গেছে। তবুও চোরাচালানকারীরা নিরাপত্তার গাফিলতির সুযোগে চোরা পথে শিকার করতে পিছপা হয় না। এই শিকার এর পিছনে অবশ্যই থাকে বাণিজ্যিক লাভের হাতছানি।

পূর্ব ভারতের পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়। এই পাহাড়ের তলদেশে আদিবাসী সাঁওতাল উপজাতি মানুষের বসবাস। এই উপজাতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও শিকার প্রথা চালু আছে। এটা অবশ্যই এদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটি রীতি বা অঙ্গ।

প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে এই উৎসব পালিত হয়। আদিবাসী সাঁওতাল উপজাতিদের এই উৎসব দিসুম সোদ্রা নামেও পরিচিত। বৈশাখী পূর্ণিমার তথা বুদ্ধ পূর্ণিমার অনেক রাত থেকে এই উৎসবের শুভারম্ভ। ঐ দিন রাতে পিতলের কলসীতে জল ভরা হয় তারপর সদ্য কাটা শালগাছের দুটি কচি ডাল ঐ জলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়। পরদিন ভোরবেলায় ঐ ডালগুলি জলের ভিতর থেকে তুলে তার রঙ দেখা হয় আর রঙ দেখার পর সেই অনুযায়ী আসন্ন শিকার সম্পর্কে অনুসরণ করা হয়। ঐ দিন ভোরবেলায় সাঁওতাল পুরুষেরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হন এবং সমবেত স্বরে গান করেন ও তার পর তারা শিকারের উদ্দেশ্য রওনা হন। শিকার অভিযানে বার হবার আগে পাহাড়ের 'সীতা চাটান' এ বন দেবীকে তুষ্ট করতে মোরগ বলি দেওয়ার রীতি আছে। কথিত বা প্রচলিত রীতি আছে যে এই উৎসবে ছেলেরা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই এসব অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি পুরুষেরা জীবনে অন্তত একবার শিকার উৎসবে যোগ দেন। শুধু এই অঞ্চলের আশেপাশে (ঝাড়খণ্ড) পুরুলিয়া (ঝাড়গ্রাম, জঙ্গলমহল) প্রভৃতি এলাকা থেকে আদিবাসী ভাইরা এই উৎসবে যোগ দেন।

মহিলারা পুরুষদের জন্য মহুয়ার মোয়া, ভাত, তরকারী, আমপোড়া তৈরী করেন। পুরুষেরা শিকারে বেরোলেও মহিলাদের এই উৎসবে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। শিকার অস্ত্র বলতে থাকে তির ধনুক বল্লম। অযোধ্যা পাহাড়ের বনে জঙ্গলে বন্য জীবজন্তু বলতে খরগোশ, ময়ুর, চিতল হরিণ বন্য শুয়োরই মূলত দেখা মেলে বেশী। আদিবাসী ভাইরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বনের এক এক প্রান্তে শিকারের সন্ধান করতে থাকে। শিকার বাগে পেলে তাকে তির ধনুক বা বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। এর পর ঐ শিকার করা বন্য জীবজন্তুর ভাগ বাটোয়ারা হয় (প্রসঙ্গত এ বিষয়ে একটি বিষয় বলে রাখা দরকার শিকারের সময়ে যদি কখন কোন বিপদ হয় তখন তিনটি ঘন্টা বাজানো হয় সতর্কতা হিসেবে)।

কখন কখনও ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে অমীমাংসিত বিরোধ থাকলে সেই অমীমাংসিত বিরোধের নিষ্পত্তি হয় ফুলহি চুড়ুপ এ।

শিকার সম্পন্ন হবার পরও ভাগবাটোয়ারা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে সীতাচাটান নামক জমায়েত স্থানে আদিবাসী ভাইয়েরা একত্র হয় ও সেখান থেকে চাঁপাফুল ও কালো সুক শিকড় সংগ্রহ করে গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

বাড়ি ফিরে এলে গৃহের মেয়েরা তাদের পা ধুয়ে দেন ও সংগৃহীত চাঁপা ফুলটি পবিত্র স্থানে রেখে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিবাহিতা মেয়েরা পুরষরা যখন শিকারে বের হন, তখন শাঁখা পলা সমস্ত গয়না খুলে রাখেন। শিকার শেষে গৃহকর্তা ফেরার পর গৃহকর্তা বা স্বামী সেই প্রসাধন বা গয়না পরিয়ে দেন।

বেশ ক বছর ধরে বনদপ্তর থেকে শিকার উৎসব বন্ধ করতে ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করতে আদিবাসী জনজাতির মধ্যে প্রচার চালাচ্ছেন। এছাড়া ঐ বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও ঢালাও খাবার ব্যবস্থার মাধ্যমে শিকার বন্ধ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর সাফল্যও মিলেছে। আদিবাসী ভাইরা এটা বুঝতে পেরেছেন যে বন্যপ্রাণী পাহাড়ের অঙ্গ। তাই বর্তমান সময়ে আদিবাসী ভাইরা একসময় শিকারে বিমুখ হয়েছেন। তবু পুরোপুরি বন্ধ করা যায় নি।

# খোয়াব

**আশীষ গায়েন**
**ছাত্র, বি.এড. (দ্বিতীয় বর্ষ)**

পাহাড়ে এক ঘর বাঁধবো
ইচ্ছে করে
সমতলকে বিদায় জানাবো
দুহাত তুলে
গাঁটছড়া বাঁধবো পাহাড়ে,
তুমি থাকবে সঙ্গে
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে,
সকাল হবে।
জমবে বরফ পাহাড় চুড়োয়
মুকুট হয়ে,
জানালার কাছে এসে বসবে
নীলকণ্ঠ।
ভালোবাসার প্রতীকী চিত্র,
সাদরে গ্রহণ করবে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
মেঘ বালিকার দল
ভিড় জমাবে দরজায়।
সূর্যের ইশারায় ফুটবে
স্বর্ণচাঁপা।
পাহাড়ি সুরে গড়বে
স্বপ্ন, শিল্পী।
দিন ফুরোবে নীল শিবের ডাকে
পড়ন্ত বিকেল যাবে
তিস্তায় পা ভিজিয়ে।
সাত রঙে সেতু আঁকবে
রামধনু।
ভালোবাসার সাঁকো না হয়
গড়বো দোঁহে মিলে।

# নাটক

# করোনাসুরমর্দিনী

**ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায়**

**অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব এডুকেশন**

**চরিত্র ঃ**

**শিব**

**নন্দী**

**ভৃঙ্গি**

**পার্বতী**

**জুড়িদারের দল**

(কৈলাশ ধাম। প্রকৃতি যেন অস্বাভাবিক। বৃষ্টি হয়ে চলেছে। শরতের মেঘে বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গর্জন। বাঘছাল পরিহিত শিব ছাইভস্মমাখা খালি গায়ে পায়চারি করছেন কৈলাশের বৈঠক খানায়। মুখে ব্যাজার ও চিন্তার ভাব। দোহারের দল ঢোল মাদল বাজিয়ে শিবের গান গাইছে সমস্বরে, হে ভোলানাথ মহেশ্বর শিব হে....) একজন দোহার ঢোল বাজাতে বাজাতে মঞ্চের মাঝখানে এসে সুর করে বলতে শুরু করে —

শুনুন শুনুন সভাজন শুনুন দিয়া মন
হর পার্বতীর কৈলাশ কথা করিব বর্ণন।
কাত্যায়নী সেকালেতে অসুর বধ করিলো।
শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর পটল তুলিলো।।
কলিকালে মায়ের লীলায় নতুন কাহিনী
করোনাসুর কে বধ করিবেক
করোনামর্দিনী।। মা আমার করোনামর্দিনী।।
সভাজন মন দিয়া দুর্গারই স্তব কয়
বলো বলো সভাজন
দুর্গামায়ের জয়।
বলো বলো দুগ্গা মায়ের জয়।।

শিব ঃ বাপরে বাপরে বাপ! সকাল থেকে কী বাজ পড়ছে আর বৃষ্টি পড়ছে বলো দেখি। এটা একটা শরৎকাল! ওই ব্যাটা নন্দী ভৃঙ্গি কোথায় গেলি তোরা? উঃ ঘোর বর্ষার মতো দিন রাত শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। কোথায় গেল শিউলি ফুল আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। ওঃ সব পাপের ফল। ওই শালা মর্ত্যপাবলিকের পাপে আমার রূপোলি কৈলাশ আমার সোনার স্বর্গ সব কেমন একেবারে লজঝড়ে হয়ে গেল। কোন কবি যেন লিখেছিলেন, নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়। এখন মর্তলোকের পাবলিক নিজেদের পাপের আগুনে নিজেরা পুড়ছে, স্বর্গটাকেও পোড়াচ্ছে। দেবাদিদেব মহেশ্বর আজ বজ্রপাত আর বৃষ্টির ভয়ে কাবু। কই রে কোথায় গেলি সব? ঐ ব্যাটা নন্দী ভৃঙ্গি শালা হারামজাদা বুড়ো ভাম!

নন্দী ঃ পেন্নাম বাবা। পেন্নাম (ছাতা মাথায় সপসপে বৃষ্টিভেজা অবস্থায় প্রবেশ)

শিব ঃ এ হে হে হে, কী দশা করেছে দ্যাখো। চেনাই যাচ্ছে না। তুই নন্দী না ভৃঙ্গি? আরে ধুত্তোরি, ধ্যাড়া মার্কা ছাতাটা

মাথা থেকে সরা। তোর শ্রী বদনটাই তো দেখতে পাচ্ছি না।

নন্দী ঃ (মুখ থেকে ছাতার আড়াল সারিয়ে) এই যে বাবা আমি আপনার শ্রী নন্দী। বৃষ্টির ঝাটে ভিজে একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছি বাবা।

শিব ঃ অ। শ্রী নন্দী? তুই তো ব্যাটা এমনিতেই সিদ্ধি রসে ডুবে নেতিয়ে থাকিস চব্বিশ ঘন্টা। আমার (এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) ওগুলো এনেছিস তো? ভিজিয়ে পিণ্ডি চটকে মটকে আনিস নি তো?

নন্দী ঃ না বাবা না, প্রাণ থাকতে ভোলা মহেশ্বরের মহাগঞ্জিকা মহাসিদ্ধি বৃষ্টির জলে ভিজতে আমি দেবো না বাবা। ব্যোম ভোলা। জয় বাবা ভোলা মহেশ্বর!

শিব ঃ আস্তে। আস্তে। ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন? তোদের মা শুনতে পেলে কী কেলো হবে জানিস? গদ্দান থাকবে তখন? এই তোদের জন্য রোজ রোজ গৃহ অশান্তি। ধুর আর ভাল্লাগে না। আস্তে বল ব্যাটা। সত্যি ভেজাস নি তো?

নন্দী ঃ উঁহু। বহু কষ্টে করে জোগাড় করেছি বাবা। দেবরাজ এবং দেবমাতার কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগত ভাবে কড়া হুকুম। লক ডাউন ভেঙে কাউকে রাস্তায় দেখলে স্বর্গের গ্রীন পুলিশে বেদম পেটাচ্ছে।

শিব ঃ ওঃ তোকেও পেটাবে নাকি? তুই না শিবের সহচর।

নন্দী ঃ সে সব খাতির এই কুড়ি সালের পরে একেবারে মুড়িয়ে গেছে বাবা।

শিব ঃ তাই নাকি? ভৃঙ্গি কোথায় গেল? ভৃঙ্গিটাও কি মুড়িয়ে গেল নাকি?

নন্দী ঃ ভৃঙ্গি? হেঃ হেঃ হেঃ

শিব ঃ এই মলো যা অমন হে হে হে করে হাসছিস কেন?

নন্দী ঃ ভৃঙ্গিকেও পাঠিয়েছি প্রভু ... হে হে হে হে

শিব ঃ ওকে আবার কোন চুলোয় চরতে পাঠালি?

নন্দী ঃ (গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে) দেবলোকের ব্যবসাতেও এখন হেভি দুনম্বরী বাবা।

শিব ঃ কী সব বলিস ছাতার মাথা। দেবলোকে আবার ব্যবসা কী?

নন্দী ঃ দেবলোকে এখন হিট ব্যবসা হলো গাঁজা ব্যবসা। হেভি বিক্রি। তাই নকল ক্রাইসিস তৈরি করেছে। বেশি চাইতে গেলেই ঘুষ। নইলে ঐ এক টুকুন। চার ছিলিম। কী হবে বাবা ওই টুকুতে।

শিব ঃ তাইতো। ঠিক কথা বলেছিস।

নন্দী ঃ তাই ভৃঙ্গি কে সুদ্দু পাঠিয়ে দিয়েছি। যা তুইও চার ছিলিম আন। যা পাওয়া যায়

শিব ঃ হে হে হে বেশ বুদ্ধি হয়েছে তো বুড়োকালে।

নন্দী ঃ হে হে হে শিবের চেলা। শিব মানেই তো জ্ঞান। হবে না বলেন?

শিব ঃ ষেঁড়ো বুদ্ধি। (হঠাৎ চমকে ওঠে) আরে ওটা কে রে? নাক মুখ ঢাকা ওটা কোন ভুত? কে রে তুই? কেলোভুত?

নন্দী ঃ খোল ওটা। চুরি চামারি করতে গিয়েছিলি নাকি? বাবা মুখে মুখোশ লাগিয়ে ওটা আমাদের শ্রীমান ভৃঙ্গি মহারাজ। এই ব্যাটা মুখোশটা খোল (ধমকে বলে)।

ভৃঙ্গি ঃ এ্যাই, মুখোশ মুখোশ করবি নি ত। এটাকে মাস্ক বল, মাস্ক। এন নাইন্টি ফাইভ

নন্দী ঃ ওঃ ওই হলো।

ভৃঙ্গি ঃ 'ওই হলো' হলেই হলো? আধুনিক হ। এটা এখন ম্যা ম্যা ম্যা ...

শিব ঃ ব্যাটা নাকের উপর ভিজে জব জবে মুখোশ লাগিয়ে কেমন ম্যা ম্যা করছে দেখ। রাম ছাগল।

নন্দী ঃ বুঝেছি ম্যা ম্যা মাস্ক। ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ। এখন ওটা খোলো চাঁদ বদন। খুলবি না ? এই নে তবে আমিই টেনে খুলে দিলুম। তোর ম্যা ম্যা ম্যা (মাস্ক টেনে খুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ভৃঙ্গি সজোরে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে দু দুবার

হেঁচে ওঠে)।

(নন্দী হাসতে হাসতে শেষে উৎকণ্ঠায় আর্তনাদ করে ওঠে) বাবা আমি শেষ। আপনিও শেষ —

শিব ঃ অমন করছিস কেন? কী হলো তোর? শেষ মানে? অমন অলুক্ষুণে কথা বলছিস যে?

নন্দী ঃ এই শুয়ারটা আমার নাকে মুখে চোখে সব জায়গায়... (হাউমাউ করে ওঠে)

ভৃঙ্গি ঃ সরি নন্দী সরি (জোরে নাক ঝেড়ে নেয় তারপর আবার সজোরে হাঁচে)

শিব ঃ এই শালা ষাঁড় তুই নন্দীকে এমন চেট মারলি কেন?

নন্দী ঃ চেট নয় বাবা ড্রপ লেট —

শিব ঃ সে কী আবার?

নন্দী ঃ সে ভয়ানক বাবা। ড্রপলেট হলো স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকের মৃত্যু ফাঁদ। বাবা আপনার গায়েও কি ঐ অসভ্য জানোয়ারটার থুতু কনা পড়েছে?

শিব ঃ পড়েছে তো! কী হবে তাতে! ওরে ভগবানের কাজই হল ভক্তের এই সব সবরকমের ইয়ে পরিষ্কার করা।

ভৃঙ্গি ঃ আমার ভুল হয়ে গেছে বাবা।

নন্দী ঃ বাবা আপনি এক্ষুনি ওই থুতুকণা ওই খরতনাক ড্রপলেট গরম জল আর সাবান দিয়ে ঘষে ধুয়ে ফেলুন।

শিব ঃ সে কী! কেন?

নন্দী ঃ হে প্রভু ব্রহ্মাণ্ড এখন আর বুড়ো মহিষাসুরের ভয়ে কাঁপছে না। ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ের কাঁপছে... ধুর, আপনি চব্বিশ ঘণ্টা ধ্যান আর সিদ্ধির ঘোরে পড়ে থাকেন। কিছুই শোনেন নি বাবা?

শিব ঃ কী শুনিনি?

নন্দী ঃ করোনা! করোনা! অসুরের বাবা অসুর। মহিষাসুরের মাথায় মাত্র দুটো সিং, এটার মাথায়, তলায়, গায়ের সর্বত্র সিং।

শিব ঃ সর্বত্র সিং! করোনা! কী সব বলিস রে ব্যাটা।

নন্দী ঃ সব বুঝিয়ে বলছি। আপনি আগে চোখ মুখ আর আপনার ঐ বিপুল জটা, বাঘছালের ল্যাঙট, গ্যাঁজার কল্কে সব শ্যাম্পু জলে চুবিয়ে নিন বাবা। আপনার একবার কোয়ারেন্টাইন মানে মিনিমাম চোদ্দ দিনের নিভৃতবাস হয়ে গেলে সৃষ্টি একেবারে বসে যাবে। ভার্গ দেবতারা পর্যন্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার করে দেবে। সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে লোডশোডিং হয়ে যাবে বাবা।

শিব ঃ সে কী রে! মারাত্মক ব্যাপার! তাহলে তো তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। কী আপদ। ওগো শুনছো ও সরস্বতীর মা (ত্রস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়) (দোহারের দল শিবগীতি শুরু করে..... ছাইভস্ম মাখাবো নেংটি তোমায় পরাবো....)

নন্দী ঃ ব্যাটা বাবার যদি করোনা ধরিয়েছিস না, তাহলে বাবার বদলে তোকে চোদ্দদিন নয় চোদ্দখানা ইঞ্জেকশনও নয়, তোর চোদ্দ গুষ্টিকে চোদ্দ শাক খাইয়ে চোদ্দ বছর কোয়েরান্টাইনে পাঠিয়ে তোকে একবারে চোদ্দপদী কবিতা বানিয়ে ছেড়ে দেব শালা জাম্বুবান। শালা মর্কট!

ভৃঙ্গি ঃ আমি কী করবো!

নন্দী ঃ অমন অসভ্যের মত হেঁচে দিলি কেন? ব্যাটা কোন সিভিক সেন্স নেই। টিভি তে 'ঘন্টা খানেক সঙ্গে পবন' দেখিস না। মিস্টার পবন দেব কেমন খবরের চ্যানেল কাঁপিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের স্টাইলে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদর্শ বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।

ভৃঙ্গি ঃ তুই অমন করে হ্যাঁচকা টান মেরে আমার মাস্ক টা খুলতে গেলি কেন? মাস্কের সুড়সুড়ি খেয়েই তো আমার অমন পেল্লাই হাঁচিটা এসে গেল। ব্যাটা তোর দোষ, সব তোর জন্যে।

নন্দী ঃ যাক গে ছাড়। বাবার যা কোটি কোটি বছরের ইমিউনিটি একটা হাঁচিতে কিসসু হবে না। হ্যা হ্যা হ্যা এবার

তোরটা বের কর তো। অনেক হয়েছে। বের কর।

ভৃঙ্গি ঃ কী বের করবো!

নন্দী ঃ ন্যাকামো মারিস না। তোর ওটা বের কর। কেউ দেখতে পাবে না।

ভৃঙ্গি ঃ কী অসভ্য কী ভাষা মাইরি তোর? দেবকুলের কুলাঙ্গার একটা। মুখ তো নয় যেন ইস্টিশানের শৌচাগার।

নন্দী ঃ মাল টা ছাড়। পাঁইতারা মারিস না। হাঁদার মতো তাকিয়ে আছিস যে। আরে গ্যাঁজাটা বের কর।

ভৃঙ্গি ঃ গ্যাঁজা? করব না।

নন্দী ঃ করব না মানে? ওটা তোর বাবার গ্যাঁজা?

ভৃঙ্গি ঃ করোনা মেশানো গ্যাঁজা। গ্যাঁজাতে কোভিড নাইন্টিন আর ওমিক্রন কিলবিল করছে। দিলে পাপ হবে। আমি দেব না।

নন্দী ঃ ইয়ার্কি মারিস না। গ্যাঁজা মদ এসব খেলে ওসব হয় না। গ্যাঁজা এক প্রকার ..... এক প্রকার ..... ঐ যা হোক একটা প্রকার। এখন দে দেখি ইয়ার্কি ভাল্লাগে না। ছোটো ছোটোর মতো থাক।

ভৃঙ্গি ঃ না হবে না। তোর কাছেও তো আছে। আমি দেব না।

নন্দী ঃ ওটা বাবার। তোরটা তোর আর আমার। দুজনের। কই দে। (রেগে যায়) না দিলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বো।

ভৃঙ্গি ঃ ওঃ উনি কুরক্ষেত্র করে ছাড়বেন। বহু কষ্টে জোগাড় করতে হয়েছে। একটুও দেবো না।

নন্দী ঃ দিবি না তো? তাহলে জেনে রাখ, এমন একটা মূল্যবান জিনিস আমিও জোগাড় করেছি না, যেটা তোকে টাচ্ করতেও আমি দেবো না।

ভৃঙ্গি ঃ ওঃ কী এমন ভাটের জিনিস জোগাড় করেছেন যে যেটা উনি টাচ্ করতেও দেবেন না। এটা কি সপ্তপদীর সুচিত্রা সেন নাকি। 'টাচ' করতেও দেবেন না। ওঃ

নন্দী ঃ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমার জিনিস আমার কাছেই থাক। এই দ্যাখ তোর চোখের সামনে এটা কেমন ঘোরাচ্ছি। হি হি হি হি। (পকেট থেকে একটা মিনি ক্যামেরা জাতীয় বস্তু বের করে ভৃঙ্গির চোখের সামনে ঘোরাতে থাকে, ভৃঙ্গির চোখ ঘুরতে থাকে লোভনীয় চকচকে বস্তুটার দিকে)

ভৃঙ্গি ঃ ওটা কী রে নন্দী দা?

নন্দী ঃ এখন নন্দী ছেড়ে নন্দীদা না চাঁদবদন? ওরে এটা তৃতীয় নয়ন।

ভৃঙ্গি ঃ তৃতীয় নয়ন!!

নন্দী ঃ ইয়েস! দেবতাদের দুই ভুরুর মাঝের ঝলমলে ত্রিনেত্রম' । দেখিস নি?

ভৃঙ্গি ঃ দেখবো না কেন? সব দেবতাদের থাকে। কারটা খাবলে এনেছিস ব্যাটা নন্দ্যাসুর?

নন্দী ঃ ওরে এটা ব্যবসার যুগ। ব্যবসার যুগে কিছু খাবলাতে হয় না, পয়সা ছড়ালেই এ্যাভেলেবেল (চোখে নিয়ে মঞ্চের সাইডে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিচে মর্ত্যের দিকে তাকানোর ভঙ্গি করে) ওঃ পুরো থাউজেন্ট পাওয়ারের মেসিন বস। সব দেখা যাচ্ছে রে (যেন গোপন নিষিদ্ধ দৃশ্য কিছু দেখা যাচ্ছে, সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখায়, সুর করে বলতে থাকে) ও হো হো হো হো, সব-সব দেখা যাছে - সব দেখা যাচ্ছে —

ভৃঙ্গি ঃ (অধীর হয়ে যায়) সব মানে! এই বল না। সব মানে?

নন্দী ঃ ওঃ ওই দ্যাখ হলিউডের নায়িকাদের প্রমোদ কানন, উই যে নেপোটিজিমের বলিউড অ্যান্ড টলিউড . হি হি হি আরে সাবাস —

ভৃঙ্গি ঃ নেপোটিজিমের বলিউড!! আমাকে একবারটি দে না রে মাইরি —

নন্দী ঃ উঁহু যার যার তার তার। তোর জিনিস নিয়ে তুই থাক।

ভৃঙ্গি ঃ বুঝতে পেরেছি শালা গ্যাঁজায় ভাগ মারার ফন্দি। তৃতীয় নয়ন না? ওরে তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেবতারা অদৃশ্যলোক দ্যাখে — অদৃশ্যলোক।

নন্দী ঃ তো কী হয়েছে? আমিও তো গোপন অদৃশ্যলোক ই দেখছি। ওঃ কী টেকনোলজি বস। ক্লিয়ার পিকচার। ভৃঙ্গি রে, দেবতাদের তৃতীয় নয়নও এখন বাজারের মাল। আরেব্বাস ওটা কী রে।

ভৃঙ্গি ঃ কী দেখছিস? বল না কী দেখছিস?

নন্দী ঃ পাতাল রেল হচ্ছে।

ভৃঙ্গি ঃ এবার মর্ত্য স্বর্গ জোড়ার জন্যে চাতাল রেল হবে। দে না ভাই একটি বার দেখি।

নন্দী ঃ উঁহু। আরে ওটা কী রে। নাচছে নাচছে। হে হে হে চিংকি চামেলি। ঝিংকি চামেলি হাই ব্বাস।

ভৃঙ্গি ঃ দিবি না তো? দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। এই দ্যাখ তবে। দে দে (জোর করে কেড়ে নিতে যায় কিন্তু পারে না। নন্দী নিজেকে ঝটকা মেরে সরিয়ে নেয়)।

নন্দী ঃ ওঃ এত সস্তা না! কেড়ে নেবেন উনি! আরে এত করার কী আছে? আমার জিনিসটা দিয়ে দে এটাও দেখতে দিয়ে দিচ্ছি। উঃ গুরু কী বলবো রে। চিঙ্কি চামেলি দেখিনি তো আগে আহা আহা (সুর করে গেয়ে ওঠে)

ভৃঙ্গি ঃ ব্যাটা শালা চরিত্রহীন লম্পট!

নন্দী ঃ হা হা বাবা ঐ সব চরিত্রহীন ফরিত্রহীন কথা গুলো হতাশাগ্রস্তরা বলে। উফ ফ ফ ফ (গভীর মনোযোগ নিয়ে দেখতে থাকে। হু হা আওয়াজ করতে থাকে যেন কত গোপন দৃশ্য সব কিছু দেখে ফেলছে)।

ভৃঙ্গি ঃ আচ্ছা দেবো। সত্যি দেবো। বাবার দিব্যি। তিন সত্যি। এবার তো দে।

নন্দী ঃ না না বৎস ব্যবসার জায়গায় ব্যবসা। ওসব ছেঁদো কথায় হবে না, একহাতে দাও অন্য হাতে নাও। দদাতি এবং প্রতিগৃহ্ণাতি। গিভ এ্যান্ড টেক। ফেলো কড়ি অ্যান্ড মাখো তেল হে হে হে হে... । উফফ কী দেখছি গো গুরু আ হা হাহা

ভৃঙ্গি ঃ আচ্ছা নে। (গাঁজার পুটুলি টা দিয়ে দেয়) এবার দে।

নন্দী ঃ হি হি হি হি হি। তবে যে। এই নে। বাচ্চা ছেলে। (যন্ত্রটা দিয়ে ভৃঙ্গির গাল টিপে দেয়, ভৃঙ্গি চোখে লাগিয়ে সটান ঝুঁকে দেখতে চলে যায় মঞ্চের পিছনের দিকে। নিচের দিকে তাকানোর ভঙ্গি করে) কী রে কী দেখছিস? লাবণ্যময়ী চিংকিকে পেলি? ভালো করে দ্যাখ —

ভৃঙ্গি ঃ (চেঁচিয়ে বলে) কই কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো!

নন্দী ঃ চেষ্টা কর — চেষ্টা কর —

ভৃঙ্গি ঃ চেষ্টা করছি তো —

নন্দী ঃ আরও কর —

ভৃঙ্গি ঃ আরও করবো মানে? এটা ত্রিনেত্রম? শালা কী না কী একটা। ইয়ার্কি হচ্ছে? মেরে মুখ ফাটিয়ে দেবো হারামজাদা।

নন্দী ঃ ব্যাটা দুর্মুখ। বাজে কথা বললে মেরে তোরও মুখোশ খুলে দেবো শালা।

ভৃঙ্গি ঃ মুখোশ খুলে দিবি? খোল দেখি মুখোশ। মুখোশ খুলবে? আয় মুখোশ খোল। দেখি কত বড়ো হিম্মত। মুখোশ খুললেই কানের গোড়ায় এমন এক খানা হেঁচে দেব না ব্যাটা করোনাতে মরে যাবি।

নন্দী ঃ তুই মর। তোর গুষ্টি মিলে মর। শালা হাঁচতে যেন আমি জানি না।

ভৃঙ্গি ঃ আমার জিনিসটা ফেরত দে বলছি ... নইলে কৈলাশে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি (চেঁচাতে থাকে)

(ছাতা মাথায় কোমরে শাড়ি প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে মারমুখী মেজাজে হঠাৎ পার্বতী মায়ের প্রবেশ)

পার্বতী ঃ কী হলো কী। কী হলোটা কী? এত চেঁচামেচি কিসের হ্যাঁ? হতচ্ছাড়া পোড়ার মুখোর দল! পাড়া মাথায় করে

চেঁচাচ্ছে! ছেলে মেয়েগুলোর ওদিকে অন লাইনে ক্লাস চলছে। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। ডিস্টার্ব হচ্ছে ওদের। ওই ছাগল তোর হাতে ওটা কী রে?

নন্দী ঃ আমার হাতে? কই। কিছু না তো মা। কই কিছু না তো।

পার্বতী ঃ কিছু না তো? খোল হাত। (নন্দী ভৃঙ্গি দুজনেই পিছনে হাত লুকায় দ্রুত) এ্যাই এ্যাই হাত পিছনে লুকোবি না। বের কর। হাত বের কর বলছি। না হলে এই ছাতা দিয়ে পেটাবো।

নন্দী ঃ কিছু না মা। হাতগুলো পিওর এ্যালকোহলে স্যানিটাইজ করা হয় নি তো। তাই পিছনে করে রেখেছি। যা জীবাণু চারদিকে। বল ভৃঙ্গি।

ভৃঙ্গি ঃ আমরা এত ক্ষণ ওই সব নিয়েই তো কথা বলেছিলুম মা। ভোলাবাবার তো বয়স হয়ে গেছে, তাই আমাদের আরও বেশি বেশি সতর্ক থাকতে হবে। হুম।

নন্দী ঃ ঠিকই মা। সেই কথাই দুজনে বলাবলি করছিলুম।

পার্বতী ঃ দু জনের বলাবলি করাচ্ছি চাঁদ। কিছু জানি না ভেবেছ? বের কর হাত (ছাতা নিয়ে তেড়ে এগিয়ে যায়)

ভৃঙ্গি ঃ এই এই যে মা এই যে (হাত বের করে)

পার্বতী ঃ তুই না। আমি ওটাকে বলছি। বের কর হাত।

নন্দী ঃ (হাত বের করে। হাতে গাঁজার পুঁটুলি) এই যে মা।

পার্বতী ঃ কী এগুলো?

নন্দী ঃ কী এগুলো (যেন কিছুই জানেনা এমন ভাব করে)।

পার্বতী ঃ কী এগুলো?

ভৃঙ্গি ঃ কী এগুলো!

পার্বতী ঃ চোপ। ইয়ার্কি হচ্ছে ... এগুলো কী?

ভৃঙ্গি ঃ এগুলো বাবা —

পার্বতী ঃ চোপ তোকে কেউ ফোড়ন কাটতে বলেনি। এগুলো বাবা মানে কি?

নন্দী ঃ এগুলো বাবার জিনিস মা —

পার্বতী ঃ তোদের মতো এই দুটো কেলো ষাঁড় আমার সাজানো সংসারটার চোদ্দটা বাজাচ্ছে।

নন্দী ঃ কেন মা? আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি।

পার্বতী ঃ বাবাকে এই নেশার জিনিস গুলো কিনে এনে সাপ্লাই দিচ্ছে কে? কারা এই সব বিষ জোগান দেয়? কী হলো? চুপ করে আছিস যে? উত্তর দে। নিজেরাও গিলবে বাবাকেও গেলাবে। নিজেরা মরে এরা ভগবানকেও মারে।

নন্দী ঃ নীলকণ্ঠ শ্রী বাবার এ যে এত কালের অভ্যেস মা!

পার্বতী ঃ জানি। সব জানি। কিন্তু এত কাল আর এই কাল কি এক? এত কালের মানুষ আর এই কালের মানুষ কি এক? এত কালের স্বর্গ আর এই কালের স্বর্গ কি এক? কী হলো? চুপ কেন? শুনে রাখ, এই কালের দিনকাল এই কালের মতোই হবে। এত কালের নীলকণ্ঠ ভোলানাথ এখন এই কালের নীলকণ্ঠ মহেশ্বর ... সিম্পল জল যে যুগে বিষ, সেখানে স্পেশাল বিষ গেলবার কোনো প্রয়োজন নেই!

ভৃঙ্গি ঃ বুঝেছি মা। আর আমরা এমন ভুল কাজ করবো না মা। মাফ করে দিন আমাদের।

পার্বতী ঃ কথা গুলো যেন মনে থাকে। আর তারও হচ্ছে আজকে। বুড়োকালের ভিমরতি আমি ছাড়াচ্ছি। (পার্বতী রাগে দুম দুম আওয়াজ তুলে বেরিয়ে যায়, কিছু সময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে নন্দীভৃঙ্গি। দোহারের দল গান শুরু করে, ছাই ভস্ম মাখাবো নেংটি তোমায় পরাবো, ঘটা করে জটা বেঁধে তোমাকে বাঁধিব হে...)

নন্দী ঃ কী রে! গুম মেরে গেলি যে?

ভৃঙ্গি ঃ পুরো কেসটা খেয়ে গেলাম আজকে। ধুর কপালটাই খারাপ —

নন্দী ঃ আরে ছাড়। মায়ের মুডটা আজকে কেঁচিয়ে আছে। এতদিন ধরে এক টানা এই রকম প্যাচপ্যাচানি বৃষ্টি বৃষ্টি চললে কোন সংসারী মহিলারই বা মুড ভালো থাকে বল।

ভৃঙ্গি ঃ তারপর আবার ওদিকে বাপের বাড়ির পুজোটাও এসে গেলো। মর্ত্যলোকের বঙ্গভূমিতে বাপের বাড়ির যা হাল ...। স্বাভাবিক।

নন্দী ঃ সবার মুখই ঢাকা। কে যে কার ছেলে, কে যে কার বাপ আবার কে যে কার বাপের বাপ চেনার কোনো উপায় নাই। হি হি হি।

ভৃঙ্গি ঃ শুধু মুখোশের কালার আর সিম্বল দেখে শুধু বাংলার পলিটিক্সের পাবলিক চেনা যাচ্ছে, কিন্তু আর কোনো বাঙালি চেনা যাচ্ছে না। হেঃ হেঃ হেঃ (নন্দী চুপ করিয়ে দেয় হঠাৎ)

নন্দী ঃ এ্যাই চুপ চুপ। শুনতে পাচ্ছিস রণরঙ্গিনী মায়ের ডায়লগ? চুপ - (বাইরে হর পার্বতীর ঝগড়ার আওয়াজ স্পষ্ট ও তীব্র হয়)

পার্বতী ঃ তোমার জন্য জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল।

শিব ঃ তোমার জন্য। সারা ব্রহ্মাণ্ড জানে আমি আগে কী ছিলাম, তুমি আসার পর আমার কী হাল হয়েছে।

পার্বতী ঃ বাজে কথা। হালটা হয়েছে আমার। তুমি বেঁচে আছো আমার জন্য, সেটা সারা ব্রহ্মাণ্ড জানে।

নন্দী ঃ কী রে শুনতে পাচ্ছিস?

ভৃঙ্গি ঃ পাচ্ছি তো।

নন্দী ঃ কী বুঝছিস?

ভৃঙ্গি ঃ অসুর বধ হচ্ছে

নন্দী ঃ ধুত, অসুর কোথায় পাবি?

ভৃঙ্গি ঃ আরে কলিযুগে পতিই তো অসুর। বিয়ে তো আর করিস নি ব্যাটা - কী করে জানবি!

নন্দী ঃ ইয়ার্কি রাখ। ওই দ্যাখ বাবাকে কেমন মলম দিচ্ছে আচ্ছা করে। এই সব কিছু শালা তোর জন্যে। ভাল্লাগে না মাইরি। ভক্তের পাপ আর ভগবানের চাপ ..

ভৃঙ্গি ঃ চুপ - চুপ -। ওই দ্যাখ যুদ্ধ করতে করতে লড়াকু দম্পতি এদিকে আসছে, চল পালাই ...

নন্দী ঃ তাই তো রে ... ওরে বাবারে চ পালাই ... প্রাণ বাঁচাই। আপনি বাঁচলে বাপের নাম (নন্দী ভৃঙ্গি কেটে পড়ে। পার্বতী ও শিবের প্রবেশ)

পার্বতী ঃ বলে কিনা বিয়ের পরে উনি বেহাল হয়েছেন। সমুদ্র মন্থনের সেদিন বউ কে বউ, মা কে মা হয়ে কোলে তুলে নিয়ে অমৃত সুধা পান না করালে বিষের জ্বালায় ওই নীলকণ্ঠ হয়েই মরতে হতো। কুইন্টাল কুইন্টাল গাঁজায় টান মারার সুখ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যেত। ভিক্ষে সুদ্দু জুটতো না। আমি অন্নপূর্ণা না হলে কে পিণ্ডি গেলাতো শুনি। জীবনটা আমার জ্বালিয়ে ছার খার করে দিলে গা।

শিব ঃ ফালতু কথা। ওসব পুরাণের ছেঁদোগল্প। কে কবে দেখেছে এসব! কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই জানে দক্ষযজ্ঞের সময় তোমার জীবন মান বাঁচাতে কী করেছি আমি। শিবের ঘরণী বলেই তুমি দুর্গা। আমার সঙ্গে বিয়ের আগে কে, কে চিনতো তোমায়?

পার্বতী ঃ আ হা হা ঘরণী। স্ত্রী সন্তানের সব দায়িত্ব নিয়ে একেবারে উদ্ধার করে দিচ্ছ। মর্ত্যের লোকজন সবাই জানে বুড়ো শিব মা কালীর পায়ের নিচে শুয়ে আরাম করে ডুগডুগি বাজায়। কাজ নেই কম্মো নেই, নেশা ভাঙ খেয়ে স্রেফ শুয়ে থাকে। লড়াই টা করতে হয় এই মেয়েদের। আমরাই কালী রূপ ধারণ করে লড়ি। মুরোদ

নেই বড়ো বড়ো কথা!

শিব ঃ কী! যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা। তুমি আমার মুরোদ নিয়ে প্রশ্ন তুলছো? আমার শিব শক্তি নিয়ে লড়াই করে তার উপর আবার বড়ো বড়ো ডায়লগ ঝাড়ছো। পরের ধনে পোদ্দারী! আজকালকার বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো সুদ্দু এ সব জানে।

পার্বতী ঃ ছেলে মেয়ে? নিজের ছেলেমেয়েগুলোর খবর কী রাখো তুমি? কতো টুকু রাখো?

শিব ঃ খবর রাখার কী আছে? তারা প্রাপ্ত বয়স্ক। এডাল্ট।

পার্বতী ঃ ওঃ ভুতের মুখে রাম নাম .. আবার ইংরেজি বলা হচ্ছে —

শিব ঃ আমি ভুত নই ভুতনাথ। ব্যাকরণটা ঠিক করে কথা বলো। শিব সন্তানেরা ঐশ্বর্য বীর্য যশ শ্রী জ্ঞান বৈরাগ্য এই সব ভগবৎ গুণের চর্চা করছে। ব্যাস। আবার কী? ওদের নিয়ে ভাবার কী আছে?

পার্বতী ঃ এই যে স্বর্গলোক, শিবলোক, মর্ত্যলোক সর্বত্র লক ডাউন, সে খবর রাখো?

শিব ঃ লক ডাউন! সে আবার কী?

পার্বতী ঃ ওই দ্যাখো, বলে লক ডাউন! সে আবার কী। ইনি নাকি দেবাদিদেব। বুদ্ধির দেবতা! জ্ঞানের দেবতা! সৃষ্টি রসাতলে যেতে বসেছে সে খবর রাখো? রাখবে কোত্থেকে, ওই দুটো কেলো ভামকে দিয়ে কুইন্টাল কুইন্টাল গঞ্জিকা আনিয়ে মহা সুখে ত্রিনয়ন লাল করে বুঁদ হয়ে আছো সর্বক্ষণ। ছেলে মেয়েগুলো সারাদিন ঢ্যাপা ঢ্যাপা স্মার্টফোন নিয়ে কী খুটুর খুটুর করছে, দেখতে পাও? ত্রিনয়নের ব্যাটারি আর কাজ করে?

শিব ঃ খুটুর খুটুরই তো করছে। সেখানে আবার দেখার কী আছে?

পার্বতী ঃ আজ্ঞে না। ওরা পড়াশুনা করছে।

শিব ঃ সেটা তো ভালো কথা!

পার্বতী ঃ না ভালো কথা নয়, ওরা অনলাইনে পড়াশুনা করছে।

শিব ঃ সেটা তো আরও ভালো কথা!

পার্বতী ঃ না আরও ভালো কথা নয়। পড়াশুনার নাম করে মন চালাচালি করছে।

শিব ঃ হেঃ হেঃ হেঃ করুক গে যা। করুক গে যা। তোমার মতো ছেলে পটানোর জন্য কঠিন তপস্যায় বসে তো যায় নি। খেয়ে দেয়ে চাকরিহীন বাকরিহীন চালচুলোহীন ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে ওরা টাইম পাস করছে। দুঃখটা কোথায় জানো সরস্বতীর মা! কোথায় সেদিনের সেই কাত্যায়নী মহাশক্তি দুর্গা আর কোথায় আজকে তার এই করুণ দুগগতি।

পার্বতী ঃ দুঃখটা কোথায় জানো গণেশের বাপ! কোথায় সেই মহারুদ্র মহাকাল আর কোথায় আজকে তার এই লজ ঝড়ে হাল। বাপের বাড়ি যাবার সময় এসে গেছে, সে খেয়াল আছে?

শিব ঃ সময় এসে গেছে বললেই হবে? গাড়ি ঘোড়া চলছে? নৌকা গজ দোলা? চলছে? যাবে কীসে?

পার্বতী ঃ (মুড পালটে যায় এবার) সেই কোন কালে মহিষাসুর, মধু কৈটভ, শুম্ভ নিশুম্ভ কে বধ করার পর থেকে কক্ষনো এমনটা হয় নি। প্রত্যেকটা বছর বাপের বাড়ির দেশে কত উৎসব কত আনন্দ কত হৈ হুল্লোড়। কত খাওয়া দাওয়া। পুজোর চারটে দিনকে টেনে টেনে আট আটটা দিন বানানোর কতো কায়দা। এবার আমার বাঙালি বাচ্চাকাচ্চা গুলো খুব কষ্টে আছে গো? (পার্বতী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে)

শিব ঃ এই দেখো তুমি আবার কাঁদতে বসলে কেন?

পার্বতী ঃ কাঁদবো না? কী যেন অদৃশ্য একটা ভাইরাস অসুরের ভয়ে সবাই কেমন ঘরের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। ঘরে ঘরে টেনশন আর আতঙ্ক। আকাশ হাসছে। শিউলি ফুল হাসছে, নীল আকাশ সাদা মেঘের ভেলা সব হাসছে, শুধু আমার বাঙালি সন্তানদের আমসি হয়ে যাওয়া মুখে এতটুকু হাসি নেই। কেউ কোথাও বেড়াতে

যেতে পারে নি। আনন্দ করতে পারে নি। বিরিয়ানি খেতে যেতে পারেনি কোথাও। এ দৃশ্য সহ্য করা যায় না গো — (কান্না)

শিব ঃ এই দেখো অমন করে কেঁদো না। ওদের নিজেদের মতো করে হাসতে আনন্দ করতে তো কেউ বারণ করেনি!

পার্বতী ঃ ত্রিনয়নটা একবার খুলে দেখো ভোলানাথ, সবার মুখ বাঁধা। সবাই নাক মুখ চোখ মাথা ঢেকে কী কষ্ট কী যন্ত্রণা নিয়ে কাটাচ্ছে মাসের পর মাস। এ সর্বনাশ গো সর্বনাশ..। (কান্নায় ভেঙে পড়ে) পুজোয় এবার তেমন করে চোখ টাটানো প্যান্ডেল করেনি ওরা। স্যানিটাইজার মাখা হাতে শুধু চোখের জল মুছে যাচ্ছে, বার বার। ভক্ত সন্তানদের এই দুঃখ আমি কেমন করে সহ্য করবো বলো। কেউ নতুন জামা কাপড় সুদ্দু কেনে নি। কোনো রকম দায়সারা করে প্যান্ডেল টাঙিয়েছে পাড়ায় পাড়ায় শুধু আমাকে এই সময়টা এলে তারা ভুলতে পারে না বলে। (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে)

শিব ঃ এই সেরেছে। এই ছিল আগ্নেয় গিরির মরণ ত্রাস তো এই এখন কান্নার শ্রাবণ মাস। কী করি আমি? চুপ করো। কেঁদো না। দেখো লক্ষ্মী - সরস্বতীর মা, তুমি কাঁদলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন ইয়ে হয়ে যায়। বুকটা কেমন হাঁচর পাঁচর করে। এই দ্যাখো কী করি এখন? ওরে নন্দী ভৃঙ্গি তোদের মা কাঁদছে যে রে ... কোথায় গেলি সব? এই দেখো এই দেখো তুমি আবার ওদিকে চললে কোথায়। (পার্বতী ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়) যেও না যেও না শোনো ... এই দেখো কাঁদতে কাঁদতে টেনশন ধরিয়ে দিয়ে ক্যামন বেরিয়ে গেলো। ও লক্ষ্মীর মা ও সরস্বতীর মা ও গণেশের মা - ও কার্তিকের মা -... (অস্থির হয়ে পড়ে। দোহারের দল গান শুরু করে ঃ ছাইভস্ম মাখাবো নেংটি তোমায় পরাবো, ঘটা করে জটা বেঁধে তোমাকে বাঁধিব হে...। গান থামলে — গাঁজার কলকে হাতে নন্দী ভৃঙ্গি আসে পা টিপে টিপে)

নন্দী ঃ (মৃদুকণ্ঠে) বাবা!

ভঙ্গি ঃ বাবা!

নন্দী ঃ বাবার মুড অফ হয়ে আছে। বাবা ... ও বাবা ....! এই দেখুন, আপনার জন্য ভালো কোম্পানির গঞ্জিকা সেজে এনেছি। কলকে আগুন সব একদম রেডি ... একটু টানবেন বাবা?

শিব ঃ মনটা আমার খুবই খারাপ রে নন্দী।

নন্দী ঃ মাঝে মধ্যে ও অমন একটু আধটু হয়। নিন না বাবা এক টান ও সব টেনশেন মেনশেন কোথায় ভ্যানিশ হয়ে যাবে। হে হে হে (শুকনো হাসি দিয়ে বাবার মন জয় করার চেষ্টা করে)

ভৃঙ্গি ঃ বাবার কাছে গিয়ে হাতে ধরিয়ে দে। দূরে দাঁড়িয়ে বাবাকে নিন না বাবা, নিন না বাবা বললে হবে? গর্দ্ধব কোথাকার! বাবা আমাদের ভূতনাথ। তোর মতো কেলো ভূত তো না। কোনো কমনসেন্স নেই।

নন্দী ঃ চুপ করতো। খালি ফালতু জ্ঞান মারে। জুনিয়ার জুনিয়ারের মতো থাকবি। (কাছে এগিয়ে গিয়ে) বাবা ও বাবা!

শিব ঃ আচ্ছা দে। এত করে সাধছিস যখন। ভালো কোম্পানির গেঁজা, না? (কলকে নিয়ে সুখ টান দেয় পর পর দুবার। ধোঁয়া ছাড়ে। শিবের মন হালকা হয়ে আসে। নন্দী ভৃঙ্গি এক রাশ তৃপ্তি নিয়ে বিস্ফারিত চোখে বাবার ভাবান্তর দেখে খুব খুশি হতে থাকে।)

কী করা যায় বলতো নন্দী ভৃঙ্গি। তোদের মায়ের মনটা খুব খারাপ। খুব কষ্টে আছে রে তোদের মা। আমি কোনো কালে এই রকম খারাপ অবস্থা দেখিনি রে। (বাবা ভেঙে পড়েন মনোকষ্টে, গাঁজার কলকেটা নন্দীকে ধরিয়ে দেয়)

ভৃঙ্গি ঃ বাবা আপনি চিন্তা করবেন না, মা কে আমরাই ঠিক করে দেব। মা কে নিয়ে একদম ভাববেন না বাবা।

সন্তানেরা ডাক ছাড়লেই মা একেবারে শেষ।

নন্দী ঃ হ্যাঁ বাবা, মায়ের মন চাঙ্গা করে দেবই। আপনি এভাবে ভেঙে পড়বেন না বাবা। বাবা ও বাবা!

শিব ঃ বল (গলাটা দুর্ভাবনায় ভারি হয়ে আসে)

নন্দী ঃ বলছিলুম কি, মহিষাসুর বধ তো অনেক কাল হয়ে গেছে।

শিব ঃ হ্যাঁ বহুকাল। আর মনেও পড়ে না তেমন। সে সব সেই কবেকার কথা —

নন্দী ঃ আমাদের মা যদি আবার সেই আগের মতো সেইরকম করে রণচণ্ডিকা কাত্যায়নী মহামায়া মূর্তি ধারণ করে ওই ত্রিলোক জ্বালানো করোনা অসুরটাকে বধ করতেন, তাহলে ভালো হতো না বাবা? মায়ের বাপের বাড়ির আত্মীয় স্বজনেরাও মুক্তি পেত, স্বর্গলোকও বেঁচে যেত আর মায়ের মনটাও একেবারে খুশ হয়ে যেত।

ভৃঙ্গি ঃ মায়ের অস্ত্রগুলোও তো অনেক কাল ধরে পড়ে থেকে থেকে কেমন জানি জং ধরে গেছে। ওগুলোও একবার শান দেওয়া হয়ে যেত।

শিব ঃ হুম, মন্দ বলিস নি। একমাত্র তোদের মা ছাড়া এই বিপদ থেকে বিশ্বকে মুক্তি দেবেই বা কে। অহং রাষ্ট্রি সঙ্গমনী বসুনাং চিকিতুষি প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম .. আহা কত কাল শুনিনি তোদের মায়ের ভুবন জাগানো সেই সব কথা।

নন্দী ঃ আমাদের আদ্যাশক্তি মা কে জাগ্রত করুন বাবা

ভৃঙ্গি ঃ দুর্গতি নাশিনী দশ প্রহরণ ধারিণী আমাদের মা কে আবার জাগ্রত করুন বাবা (বাবার পায়ে দুজনে লুটিয়ে পড়ে) বাবা ...

শিব ঃ এই ছাড় ছাড়। জাগ্রত করুন বাবা বললেই কি জাগ্রত হবে নাকি? এত সোজা? দাঁড়া, ভাবতে দে। এটা কখনোই শিবের একার কম্মো নয়। সব দেবতাদের তীব্র ভূমাতেজ সম্মিলিত হলে তবেই তোদের মা মহাশক্তি রূপে আবির্ভুতা হন। কী বুঝলি?

নন্দী ঃ হে হে হে (দন্ত বিকশিত করে বোকার মত হাসে) ওসব তত্ত্বকথা কি আমাদের মোটা মাথায় ঢোকে বাবা?

ভৃঙ্গি ঃ ওসব যা করার আপনি করুন বাবা। এর জন্য আমাদের যা করতে বলবেন টাইম টু টাইম সাপ্লাই দিয়ে দেব।

শিব ঃ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একসঙ্গে মিটিঙে হাজির করানো খুবই অসম্ভব ব্যাপার।

নন্দী ঃ কোনও চিন্তা নেই বাবা। এই যে (মোবাইল ফোন বের করে দেখায়)

শিব ঃ ওটা কী?

ভৃঙ্গি ঃ ফোন .. হি হি হি স্মার্ট ফোন বাবা। মর্ত্যের এক ভক্তকে ম্যানেজ করে এই যন্তরটা জোগাড় করে নিয়েছি। এতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। এখন তো সবই অন লাইন কেস।

শিব ঃ অনলাইন কেস? কী বলিস?

ভৃঙ্গি ঃ দেবতাদের নিয়ে একটা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে নিলেই কাজ শেষ। আপনি টাইম টু টাইম সব দেবতাকে খবর দিয়ে দেবেন।

নন্দী ঃ ব্যাস। যা চাইবেন হুড়মুড় করে হয়ে যাবে।

শিব ঃ তারপর —

নন্দী ঃ তারপর সব দেবতারা একদিন ইনকেলাব জিন্দাবাদ করতে করতে ব্রহ্মার কাছে এক সঙ্গে মিছিল করে গিয়ে আবেদন করুক। কী বলিস ভৃঙ্গি? ঠিক না বেঠিক?

ভৃঙ্গি ঃ ঠিক ঠিক। তারপর ব্রহ্মার কাছে দেবতারা এই ভাইরাসাসুরের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করুক ...

নন্দী ঃ স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সব কিছু শোনার পর ক্ষেপে গিয়ে ত্রিনয়ন দিয়ে তেজ বিকিরণ করতে শুরু করলেই —

ভৃঙ্গি ঃ কেল্লা ফতে। সব দেবতারা এক যোগে ক্ষেপে গিয়ে সবাই তেজ বিকিরণ করতে শুরু করবে। আর তখনই মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে জেগে উঠবেন মহা তেজরূপিণী আমাদের মা (নন্দী ভৃঙ্গি উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত ও আবেগ মথিত হয়ে ওঠে) দেবী কাত্যায়নী। মহামায়া। ত্রিগুণাত্মিকা, জয় মা কাত্যায়নী। (নন্দী ভৃঙ্গি একসঙ্গে 'জয় মা কাত্যায়নী' বলে জয়ধ্বনি দিতে থাকে —।)

শিব ঃ এই তোদের মাথা ফাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো?

নন্দী ঃ কেন বাবা?

শিব ঃ টেম্পারেচার ঠিক আছে তোদের?

ভৃঙ্গি ঃ বাবা আপনি কিন্তু একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করছেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়।

শিব ঃ মহাঋষি ক্যাত্যায়নকে এই কালে কোথায় পাবি? সেই বুড়োটা কি আছে এখনো? কবে টেঁসে গেছে তপস্যা করে করে। ওদিকে ব্রহ্মারও যথেষ্ট বয়স। হাঁপানি আছে। এই অবস্থায় দেবতারা স্বাস্থ্যবিধি ভেঙে সেখানে গিয়ে গ্যাদারিং করলে স্বর্গের পুলিশেরা ছেড়ে দেবে ভেবেছিস? এ সব হবে না। হবে না।

নন্দী ঃ হবে না মানে? কী হবে না? আপনি এ ভাবে আমাদের পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিতে পারেন না।

ভৃঙ্গি ঃ বুঝে গেছি, নারী শক্তি, স্ত্রী শক্তি, জাগুক আপনি চান না।

নন্দী ঃ (শ্লোগান শুরু করে দেয়) মায়ের শক্তি সেরা শক্তি শিব শক্তি নিপাত যাক (নন্দী ভৃঙ্গি এক সঙ্গে শ্লোগান দেয় নিপাত যাক নিপাত যাক)

ভৃঙ্গি ঃ শিব তন্ত্র পুরুষ তন্ত্র নিপাত যাক নিপাত যাক (নন্দী ভৃঙ্গি এক সঙ্গে নিপাত যাক নিপাত যাক)

শিব ঃ চোপ। ইয়ার্কি হচ্ছে। আমি হবে না বলেছি? ঠান্ডা মাথায় ভাবতে বলেছি শুধু। পলিটিক্স হচ্ছে! নিপাত যাক নিপাত যাক। এই করে করে পুরো মর্তলোকটা মরেছে এবার শালা তোরাও মরবি। মৃত্যুমন্ত্র শিখে ফেলেছিস হারামজাদার দল।

নিপাত যাক নিপাত যাক। এই সব না করে নিজেরা সাধনা তপস্যা করে মা কে জাগানোর চেষ্টা করতে পারো না? মা যে কান্নাকাটি করতে করতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, তাকে ফিরিয়ে এনে তার কান্না মুছিয়ে দিতে পারো না উল্লুকের দল। মাতৃভক্তি হচ্ছে? শুধু রাজনীতি করার ধান্দা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলো না, মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র? ওই ব্যাটা লেখক নেক্সট টাইম জন্মালে আমি বলে দেব আবার লেখ - আবার লেখ - নিম্নমার্গের রাজনীতিই হচ্ছে আসল বিষচক্র।

কী হলো চুপ মেরে গেলি কেন? প্রকৃত মাতৃভক্তি আছে?

নন্দী ঃ আমরা মাকেই চাই —

ভৃঙ্গি ঃ মা ই আমাদের সব —

শিব ঃ তাহলে ধূপ ধুনো নৈবেদ্য নৃত্য বাদ্য আর জাগৃতি মন্ত্রে মায়ের বোধনের ব্যবস্থা কর। জাগা তোদের মা কে। জাগা। ওরে জাগা। ত্রিলোক কাঁপিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ কর।

নন্দী ঃ (ভৃঙ্গির সাথে একসঙ্গে বলে —)

ভৃঙ্গি ঃ বলুন বাবা সেই জাগরণের মন্ত্র। জয় মা চিন্ময়ী। জয় মা জগজ্জননী।

শিব ঃ জোরে জোরে বল - জোরে জোরে বল। নমস্তে সিদ্ধ সেনানী / আর্যে মন্দর বাসিনী / কুমারী কালী কাপালী কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে (নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টা ঢাকের আওয়াজ। নন্দীভৃঙ্গি এক সঙ্গে মন্ত্র বলতে থাকে শিবের সঙ্গে) ভদ্রকালী নমস্তভ্যাং মহা কালী নমোস্তুতে - চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যাং... ওই দ্যাখ নয়ন মেলে তাকিয়ে দ্যাখ, তোদের মা আসছে। ভক্তের ডাক চি চিং ফাঁক। ওই দ্যাখ তোদের মায়ের নতুন রূপ। অন্তর আলো করে নয়ন মেলে দ্যাখ — ওরে দ্যাখ - নয়ন মেলে দ্যাখ।

নন্দী ঃ (ভৃঙ্গির সাথে গলা মিলিয়ে জয়ধ্বনি করে —)

ভৃঙ্গি ঃ জয় মা মহামায়ার জয়। জয় মা দুর্গার জয়।

(পার্বতীর যোগিনী যোগমায়া রূপে প্রবেশ)

শিব ঃ কে তুমি? তুমি তো সরস্বতীর মা নও! ভক্তের ডাকে তুমি আবির্ভূতা আদ্যা জননী! গীতায় তুমিই তো বলেছিলে ঃ 'যো মাং পশ্যন্তি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণস্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি'।

নন্দী ঃ মা আপনি জাগ্রত হন মা!

ভৃঙ্গি ঃ স্বর্গ মর্ত্য প্রেত লোকের দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য আপনাকে জাগ্রত হতেই হবে মা!

শিব ঃ এরা সবাই তোমাকে নতুন করে আবার জাগাতে চাইছে, দ্যাখো। তুমি চোখ মেলো জগদম্বা —

নন্দী ঃ তোমার কণ্ঠে সেই ত্রিভুবন কাঁপানো রণ হুংকার আবার শুনবার জন্য সবাই কান পেতে আছে মা!

ভৃঙ্গি ঃ গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ়

নন্দী ঃ মধু যাবৎ পিব্যাম্যহম

ভৃঙ্গি ঃ ময়া ত্বয়ী হতোত্বৈব

নন্দী ঃ গর্জিসন্তাযু দেবতা ... মা মা-গো, জাগো মা!

পার্বতী ঃ চুপ (শান্ত উচ্চারণে থামিয়ে দিয়ে) কী বলিস তোরা? এসব কী বলিস? কেন বলিস? কিসের কোলাহল তোদের?

শিব ঃ তুমি জাগ্রত না হলে কী করে হবে? অসংখ্য অসুরের উপদ্রবে এই সৃষ্টি এই ব্রহ্মাণ্ড যে আবার ছারখার হতে বসেছে।

নন্দী ঃ অসুরনাশিনী রূপ ধারণ করো মা!

ভৃঙ্গি ঃ দশ মহাবিদ্যা তুমি আবার প্রকট করো মা!

নন্দী ঃ তুমি জাগো মা —

পার্বতী ঃ নয়ন মেলে দেখ, আমি সদা জাগ্রতা। আমি অতন্দ্রা। আমি চিন্ময়ী। তোরা ভাগ্যহীন তাই শুনতে পাসনা। তোরা নির্বোধ তাই দেখতে পাস না। তোরা অজ্ঞান তাই জানতে পারিস না। পুজোর ছলে শুধু ভুলে থাকিস আমাকে। পুজোর ছলে শুধুই ভুলে থাকিস আমাকে।

নন্দী ঃ মা —

ভৃঙ্গি ঃ মা —

পার্বতী ঃ শুনে রাখ অমৃতের পুত্র। তোদের সবার মধ্যে যে শুভ চেতনা আছে, জ্ঞান বিজ্ঞান মেধা আছে, লড়াইয়ের কঠিন সাহস আছে, সব দুঃখের এবং যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে জীবনটাকে আনন্দ মুখর করে তুলবার জোর আছে, ওই জোরটাই আমি। ওই শক্তিটাই আদ্যাশক্তি অসুরনাশিনী দুর্গা। প্রত্যেকের হৃদয়ে, ওই জাগ্রত চিন্ময়ী শক্তিই আজ করোনাসুরমর্দিনী। (নেপথ্যে দুর্গাস্ত্রোত্র গীত হতে থাকে। ঢাকের আওয়াজ। শঙ্খ ধ্বনি। অসুরনাশিনী দুর্গা পুজোর বোধন শুরু হয়ে যায়।

।। সমাপ্ত।।

# Moral values and Ultra modern generation

**Arghya Kamal Das, Student (B.Ed. 2nd year)**

## Introduction

Moral values are the models of Good and bad, which direct a person's conduct and decisions. A person may adopt moral values from society and government, religion, or self. They are also inherited from the family as well.

In Past ages, it was uncommon to see couples who lived respectively without the advantage of legal marriage rules. Of late, couples that set up a family without marriage are about as common as conventional wedded couples. There has been a shift in the moral values from time to time. For instance, in earlier times, the laws and ethics essential you originated from the cultures of a family and society as a whole. As society moved into the advance time, these have largely disintegrated and people today tend to show their own morals they want to follow.

## Definition :

Moral values, as the name says, implies the significance of the moral qualities in the conduct of the kids, the youth and everyone on in life. Primarily the moral values are the qualities which one gains from life through the journey of life. They also depict the standards of what is right and what is wrong for us which we learn in the schools and in the workplace and from our surroundings as well. The beliefs which we gain from the family and the society that directs us how we lead our lives is what moral values are all about.

## Moral values in India :

India is a country which has been known for its values since the ancient times. We Start to learn moral values from our family. In India, children are taught to respect their elders, greet them properly whenever they meet them. This is a way of showing respect towards the elders. A child knows that he is Supposed to obey whatever is asked by the elders. Such a moral value inculcates obedience in the mind of a child. Moral values are important for all of us in order to make us live a life of a good human being.

## Important moral values in life :

Although there are numerous moral values which one should follow in life, there are some of them which should be followed by almost everyone in the world. Firstly always speaking the truth is one such moral value. We should never speak lies no matter what the circumstance is. Also, we should respect our elders. Our elders have been and experienced the world better than us. It is always good for their blessings and advice in our important decisions. Loyalty towards our work and integrity are other such moral values which should be practiced by one and all.

## Examples from history :

There have been many examples from history which have been depicted the important and rightful following of moral values in life. One such example which we all are familiar with is from our epic

Ramayana. Lord Ram was asked to go to fourteen years in exile just because his father King Dasaratha had granted a wish to the queen Kaikeyi. He could have refused it as well as it was not he would had granted the wish. But just to keep his father's words he accepted the exile graciously and went into exile. Not only this, his wife Sita and his younger brother Lakshman also followed his footsteps as they believed that it was their Prime duty to follow him.

## The Scenario Today :

Such was the moral value depiced during that period. But, now things are so different. People seem to have forgotten their moral values and are more fucused on modern life. There are a number of instances every day where parents are left alone by their children to live a lonely old life. Many of them even die in isolation and there is no one to look after them during the last years. Apart from this, there are frequent quarrels between families over petty matters which could have been avoided if the people remembered the moral values our ancestors stood for.

Nowadays, people smoking and drinking and that too in front of their parents and children is a common sight. This is so against our moral values. We should not teach our children the evils, such habits can do harm them in later years of their life.

## The Remedy Available :

Since there has been a strong drift in the moral values of the people, the government has initiated to make the students learn about moral values in life and their importance to us. In order to execute this, schools of today teach moral values to the children in a greater sense. This is important as the students are the future of tomorrow. If the schools and the families alike teach the children such values from childhood, they shall turn into good human beings when they grow up.

## Conclusion :

Moral values depict our character to the outer world. They are of extreme importance in our lives. In earlier times, people were so determined to follow these values inherited from our ancestors. Such was their determination that once committed they never went back on their words. But with modernisation and urbanisation, we have seemed to have lost our moral values somewhere. Children disrespecting their parents are a common sight nowadays. But, we should not blame the children for this. It is perhaps our own upbringing which has led to such immoral practices all over. It is we who should inculcate the moral values in our life first. Children will follow what they observe around them. If they shall see people living in joint families together and respecting each other, even they shall do so when they grow up. If we speak lies to our children even they shall do so. For the children imbibe the habits they see in their parents, teachers, peers at school and others around them. So, it is we who have to take the first step forward. The children shall surely follow us. Moral values give us character and strength. If each one us practice some moral values in life, there would be peace and harmony allaround. Moreover, we shall have a bright future for our next generations as well.

# The beauty of love

**Samrat Bisai**
**Assistant Professor**
**Ramkrishna Mission Brahmananda College of Education**

I feel jealous of you Radha,
For you have the glory to process Krishna.
I feel jealous for the beauty of your heart which binds Krishna in your love.
I neither have the power to bless others,
Not the glory of love I have,
Not the purity of heart also.
Oh Radha! teach me half of your love,
To tolerate the pain which coming out of your love.
Teach me the respect and trust,
Which comes out from the pure heart.
Oh Radha! sit in my heart to bless me with love,
Lead me to the land of eternity,
Where thy love is truth and everything is frailty.

# Science: In the Eyes of Swami Vivekananda

**Swami Nirishananda**
**Principal(Actg.)**
**Ramakrishna Mission Brahmananda College of Education**

Science helps us to become fearless thinkers, develops a broad and positive outlook, increases our self-confidence and improve the quality of life by sharpening our intellect and sensitivity. This is of utmost importance for human progress.Knowing this fact,Swami Vivekananda studied all the latest scientific developments of his time. Thus, having direct access to the fountainhead of all knowledge, he could not only comment on ***scientific theories*** of his time but could also ***intuitively*** put forward newer ones.

Time cannot exist in the absence of matter and space. This is precisely the essence of the profound notion put forward by Swami Vivekananda for **NicolaTesla** to formulate.**Tesla** was also greatly influenced by the ideas of Swami Vivekananda 'on the link between the soul and Godhead, Prana (life force) and Akasha (ether) and its equivalence of the universe, force and matter', which were included in his treatise on human condition and the role of technology in shaping world history in an article published in ***The Century Magazine***.

Swamiji had strengthened the foundations of the Theory of Relativity- the paradigm shift in human history of ideas.In this context Swamiji stated:

> We have matter and force. The matter, we do not know how, disappears into force and force into matter. Therefore, there is something which is neither force nor matter as these two may not disappear into each other.

In the field of biological sciences, Darwin has made a significant impact through his theory of evolution. He established that all species have descended over time from a common ancestor, and proposed the theory that this matching pattern of evolution resulted from a process that he called 'natural selection' or 'survival of the fittest'.The theory of natural selection was supported by Swami Vivekananda as well. He rightly exclaimed:

> Do you not hear what your modern scientific men say? What is the cause of evolution? Desire. The animal wants to do something, but does not find the environment favourable, and therefore develops a new body. Who develops it? The animal itself, its will. You have developed from the lowest amoeba. Continue to exercise your will and it will take you higher still.

Swamiji, however, did not agree with Darwin's theory in all aspects. For instance:

> Can **Darwin**'s theory of evolution be said to be applicable to the animal and vegetable kingdoms-but not to the human kingdom where reason and knowledge are highly developed? In our saints and ideal men, we find no trace of struggle whatsoever, and no tendency to rise higher and grow stronger by the destruction of others. There we find sacrifice instead. The more one can sacrifice the greater he is.

Swami Vivekanada was a ***science-minded monk*** who would believe anything only after judging the fact

with proper analysis.He advocated testing thoroughly before making one's decision of accepting or denying. The following extracts from Swamiji highlight his scientific mind-set:

> Believe nothing until you find it out for yourself.
>
> You must exercise your own reason and judgement; you must practice, and see whether these things happen or not.
>
> What little I know I will tell you. So far as I can reason it out I will do so, but as to what I do not know I will simply tell you what the books say. It is wrong to believe blindly. You must exercise your own reason and judgement.
>
> Every human being has the right to ask the reason, why, and to have his question answered by himself, if he only takes the trouble.
>
> It is not the sign of a candid and scientific mind to throw overboard anything without proper investigation.

Very often, Swamiji used to refer to principles of Chemistry with examples to explain any matter irrespective of the subjects. In his quest for understanding the external world, Chemistry was chosen by man to deal with the nature of objective materials, their compositions and associated chemical reactions. Swamiji was fond of scientific knowledge, and wanted that everyone should follow scientific methods to understand any subject. Swamiji's reiterations on science show his ***Scientism***:

> In acquiring knowledge, we make use of generalisations, and generalisation is based upon observation. We first observe facts, then generalise, and then draw conclusions or principles.
>
> So we must work faithfully using the prescribed methods, and light will come.
>
> What is the use of such knowledge? In the first place, knowledge itself is the highest reward of knowledge, and secondly there is also utility in it.
>
> Every science must have its own method of investigation.
>
> Each science requires certain preparations and has its own method, which must be followed before it could be understood.
>
> We know we must observe in order to have a real science. Without a proper analysis, any science will be hopeless – mere theorising. And that is why all the psychologists have been quarrelling among themselves since the beginning of time, except those few who found out the means of observation.

According to Swamiji, **concentration** is the only means to attain knowledge. His oft-quoted lines regarding the ***science behind concentration*** are given here below:

> The instrument is the mind itself. The power of attention, when properly guided, and directed towards the internal world, will analyse the mind, and illumine facts for us. The powers of the mind are like rays of light dissipated; when they are concentrated, they illumine. This is our

> only means of knowledge.
>
> There is only one method by which to attain this knowledge, that which is called concentration. The chemist in his laboratory concentrates all the energies of his mind into one focus, and throws them upon the materials he is analysing, and so finds out their secrets.
>
> How has all the knowledge in the world been gained but by the concentration of powers of mind? The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give it the necessary blow. The strength and force of the blow come through concentration. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point; that is the secret.

All perception involves signals that go through the nervous system, which in turn results from physical and chemical stimulation of the sensory system. Perception is shaped by the recipient's learning, memory, expectation and attention. The brain constructs the experience of reality using sensory information from memory, fears, desires and goals. Sometimes the experience of reality is distorted and results in so-called visual and auditory illusions. It is amazing that Swami Vivekananda, the religious teacher, has given excellent ***scientific explanations of perception*** as follows:

> The genesis of perception is as follows: the affections of external objects are carried by the outer instruments to their respective brain centres or organs, the organs carry the affections to the mind, the mind to the determinative faculty.
>
> One can perceive how the sensation is travelling, how the mind is receiving it, how it is going to the determinative faculty.
>
> Modern psychologists tell us that the eyes are not the organ of vision, but that organ is in one of the nerve centres of the brain, and so with all senses; they also tell that these centres are formed of the same material as the brain itself.
>
> There are in nature gross manifestations and subtle manifestations. The subtle are the causes, the gross the effects. The gross can be easily perceived by the senses; not so the subtle.

Once Swamiji explained to the Maharaja of Khetri about the science of perception as follows:

> It is the mind which classifies sense-observations and moulds them into laws. It is a phenomenon of intelligence and experience. The order of experience is always internal. Apart from the impression received through the sense-organs and the reaction of intelligence upon these, in an orderly and consecutive manner, there is no law. The scientists say that it is all homogeneous substance and homogeneous vibration. Experience and its classification are internal phenomena.

Following upon this statement Swami Vivekananda spoke of the Sankhya Philosophy and showed how modern science corroborated its conclusions. In Vedanta it is clearly mentioned that nothing can be established in absolute truth without strength, and one of the sources of this strength is the right food. He tried to show the ***importance and science of health and well-being*** among the masses. Swamiji exclaimed:

> The body must be properly taken care of.

> You must keep a strict eye on your health; let everything else be subordinated to that.
>
> Consciously or unconsciously, health can be transmitted. A very strong man, living with a weak man, will make him a little stronger, whether he knows it or not.
>
> How will you struggle with the mind unless the physique is strong?
>
> First build up your physique. Then only you can get control over the mind.
>
> If you take the pains to give them (strong bodied persons) good ideas once, they will be able to work them out sooner than physically unfit people.

People generally believe science and philosophy are antagonistic. Swamiji tried to remove this erroneous notion by comprehending the truths in them.Swamiji said that science is the search for truth in the external world, and religion is the search for truth in the internal world; pushed to the extreme, they both meet as there is one truth that is expressing itself externally and internally. Genuine happiness requires a proper balance between the two.Swamiji explained ***religion through the prism of science*** as follows:

> All science has its particular methods; so has the science of religion.
>
> Religion must become broad enough. Everything it claims must be judged from the standpoint of reason.
>
> When we want to study religion, we should apply this scientific process.
>
> Experience is the only source of knowledge. In the world, religion is the only science where there is no surety, because it is not taught as a science of experience. This should not be.

Albert Einstein (1879-1955) also summed up the relationship between religion and science in the same vein as was done by Swami Vivekananda. Einstein said, "Science without religion is lame, religion without science is blind".

Swami Vivekananda wanted the ***Indian History to be depicted on scientific basis***. He exclaimed:

> Learn accuracy, my boys! Study and labour, so that the time will come when you can put our History on a scientific basis. For now, Indian History is disorganised. It has no chronological accuracy.
>
> Study Sanskrit, but along with it study Western Science as well.
>
> Now it is for us to strike out an independent path of historical research for ourselves, to study the Vedas and Puranas and the ancient annals of India, and from these make it our life's Sadhana to write accurate, sympathetic and soul-inspiring histories of the land.

The educational ideas of Swami Vivekananda were based on his first-hand knowledge and deep sympathy for the masses. For example, Swamiji said:

> Kindle their knowledge with the help of modern science.

> Give them ideas that is the only help they require and then the rest must follow as effect. Ours is to put the chemicals together, the crystallization comes in it is the law of nature.
>
> There are thousands of single-minded, self-sacrificing sannyasins in our country, going from village to village, teaching religion. If some of them can be organized as teachers of secular things also, they will go from place to place, from door to door, not only preaching but teaching also. Suppose two of these men go to a village in the evening with a camera, a globe, some maps etc., they can teach a great deal of astronomy and geography to the ignorant.

Swami Vivekananda had experienced the ***ancient truths*** through his inward journey. Along with it he had the pulse of ***western scientific approach***. He influenced the Maharaja of Khetri to take an active interest in scientific study, urging upon him the country's need for scientific training and researches. Swamiji ordered some science primers and some scientific instruments of a simple order and himself began to teach the Maharaja of Khetri. He was the first religious leader who boldly declared: We talk foolishly against material civilization. … Material civilization, nay, even luxury, is necessary to create work for the poor.

> If you are to live at all, you must adjust yourself to the times. If we are to live at all, we must be a scientific nation.
>
> The old institution of 'living with the Guru' and similar systems of imparting education are needed. What we want are western science coupled with Vedanta.
>
> For practical purposes, let us talk in the language of modern science.
>
> True science asks us to be cautious. ... Begin with disbelief; analyse, test, prove everything and then take it.

Science helps to build knowledge, construct new ideas that illuminate the world around us, develop certain cognitive skills suc has logical reasoning, critical thinking and decision-making. Scientific knowledge helps to satisfy many basic human needs and improve standard of living. But scientific outlook does not depend on formal education provided in educational institutions alone; it is also dependend on the innate capacity of human brain to think rationally and draw appropriate conclusion. If a person possesses real quest for knowledge, thinks critically and logically, that person must be considered as a science-minded person. Swami Vivekananda wanted every person to have scientific outlook, and there would be no blind belief in any matter for the betterment of the society.

**Sources:**

Dabholakar, N. (2018). *The Case for Reason*, Westland publications.

Gambhirananda, S. (1960). *The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples.* AdvaitaAshrama, pp. 214-221.

Gupta, M. (1942). *The Gospel of Sri Ramakrishna*. Ramakrishna-Vivekananda Center, pp. 11-41.

Majumdar, K. S. (2012). *Vivekananda on Science and Religion*. Frontier, Vol. 44, No. 26.

Mallik, F., & Bhattacharyya, D. (2015). Thought of Swami Vivekananda on Mass Education. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, Vol. 5 (8), pp. 132-136.

Murthy, K. G. T. (2011). *Swami Vivekananda an Intuitive Scientist*. Sri Ramakrishna Math, Chennai, pp. 26-54.

Paramanik, B., Maity, N. &Bera, A. (2017). Swami Vivekananda: Today and Tomorrow. *International Journal of Research and Analytical Reviews*, Vol.-4(4), p. 349.

Roy, P. & Ghosh, P. (2015). *Swami Vivekananda's Concept on Mass Education and its Relevance in Present Day of Context,* Vol. 4.

Sanford, Antony, J., & Emmott, C. (2012). *Mind, brain and narrative*. Cambridge University Press.

Vivekananda, S. (1999). *The Complete Works of Swami Vivekananda*. AdvaitaAshrama.

Wesseling, H. (1998). *History: science or art*? Academia Europaea, UK, Vol. 6(3), pp. - 265-267.

# Sri Ramakrishana & Swami Vivekanada : Architect of Bharatmata

**Maxim Kamal**
**Student, B.Ed. (2nd year)**

Sri Ramakrishna Paramhansa Dev was the era of an institution and Swami Vivekananda was an ideal disciple of his tradition. After a century of their physical existence, they still live in the core of our heart. Along with their words, our every morning begins and ends with their creations. They were the lungs of human civilization - it may be 20th century, 21st or 22nd and so on. We have entered into a new century, but essentially, as we will move towards a new millennium, in many respects, there will be radical changes in our ways of living, feeling life, envisioning our futures and more so - a revolution, in an unconscious state of dynamic world. Their idealism is the only weapon to remove all darkness that is eating into the vitals of the society. That's why their new understanding of religion, new principle of morality and ethics, concept of East-West, contribution to India, contribution to Hinduism, their teachings are still relevant in enlightening us.

Education, according to Swamiji, is incomplete without the teachings of aesthetics or fine arts. He proposed that we need technical education to develop industries so that men instead of seeking for service may earn enough to provide for them-selves and save something against a rainy day. He felt that India should take all that are good in the Western civilization. The entire educational program should be so planned that it equips the youth to contribute to the material progress of the country as well as to maintain the supreme worth of India's spiritual heritage.

"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. We must have life-building, man-making, character making, assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library." If education is identical with information then the libraries would be the greatest sages in the world and encyclopedias the Rishis.

Swami Vivekananda pointed out that the defect of the present-day education is that it has no definite goal to pursue. Swamiji attempted to establish through his words and deeds that the end of all education is man making. He prepared the scheme of this man making education in the light of his over-all philosophy of Vedanta. He defined education as "the manifestation of the perfection already in man. The aim of education is to manifest in our lives the perfection, which is the very nature of our inner self." This perfection is the realization of the infinite power which resides in everything and everywhere, existence, consciousness and bliss. After understanding the essential nature of this perfection, we should identify it with our inner self. For achieving this, one will have to eliminate one's ego, ignorance and all other false identifications which oppose the way. Meditation evolves moral purity and passion for truth and helps man to leave pride, ego and all other perishable elements.

Swami Vivekananda laid great stress on physical health because a sound mind resides in a sound body. According to him, the mind of the students has to be controlled and trained through meditation, concentration and practice of ethical purity. All success in any line of work, he emphasized, is the result of the power of concentration which necessarily implies detachment from other things, is one of the guiding mottos of his scheme of education.

**Sri Ramakrishana & Swami Vivekanada : Architect of Bharatmata** Maxim Kamal

Swami Vivekananda suggested that the nonsectarian and harmonizing spirit of Sri Ramakrishna's philosophical teachings are not captured by any particular philosophical school, but reveberated by the original nonsectarian Vedanta of the Upanishads and the Bhagavad Gita.

To be religious for Swami Vivekananda means leading life in such a way that we manifest our higher nature, truth, goodness and beauty through our thoughts, words and deeds. All impulses, thoughts and actions which lead one towards spirituality are naturally ennobling, harmonizing, ethical and moral in the truest sense.

Swamiji said that for the development of a balanced nation, we have to combine the dynamism and scientific attitude of the West with the spirituality of our country. He said "Socialism or some form of rule by the people…..is coming on the boards."

Swami Vivekananda's philosophy led him to view society as clearly organic in character. Society is, according to him, is the aggregate of individual homes but differing in nature from a mere arithmetical sum. Like the individual home, it is bound by bonds of union because of which each of its parts is responsive to what happens in other parts. The purpose of society, as he saw, it is the realization of unity 'to move slowly towards the infinite whole.' The existence of democracy is Swamiji's ideal society.

The civilization and culture of India abounds with innumerable regional, social and linguistic diversities. But in spite of these differences, one can perceive a basic unity that has projected an unbroken continuity in Indian culture from Vedic times to the present day. According to Swami Vivekananda, "the life-centre of Indian culture is spirituality." By spirituality is meant a way of life oriented for the realization of the Supreme Spirit or God.

Swamiji's idea on the significant role of spirituality in the Indian context also stemmed from his understanding of the Indian literature. Swami Vivekananda mentioned that in kali age the gift of spirituality, gift of secular knowledge, and gift of life are more important. We must die, that is certain; let us die then for a good cause. Let all our actions – eating, drinking and everything that we do, tend towards the sacrifice of our self. This evidently illustrates the Upanishadic ideal "nakarma?anaprajayadhanenatyagenaikeam?tatvamanasuhu" - not by actions, not by progeny and not by prosperity but only through sacrifice can the seeker achieve immortality. We nourish our body, we nourish our minds by reading books; there is no good in doing that unless we held it also as a sacrifice to the whole world. "Spirituality and culture are two sides of the same coin. Culture grows into a tree where spirituality is sown as the seed." Having established the significance of spirituality, Swami Vivekananda advocated for a combination of science with spirituality. He wanted India to have both material prosperity and spiritual development. He added that the wings of peace and love made the flight of this spirituality possible.

On economic development of the country, Swami Vivekananda possessed his own views on the economic issues like eradication of poverty, agricultural and industrial development, condition of the labouring people and economic system.

Swami Vivekananda's analysis of poverty of the Indians and his views on the exploitation of the Indians by the British rulers revealed that primary source of wealth of Europeans was the Indian resources. An important facet of Swami Vivekananda's socio-economic thought was his sympathy for the poor labouring people. That's why Swamiji is described as the first socialist of India.

Swamiji?s interpretation of history may be designated as historical spiritualism. He predicted that social development would ultimately result in the establishment of the Sudra rule. He pointed out that the

society in different phases was dominated by Brahmins, Khatriyas Vaishyas. Swamiji believed that a day would come when the Sudras would emerge as a strong, social force. Swamiji, was not in favour of annihilating and crushing the upper class. He wanted to improve the lot of the lower strata of the society through proper education and necessary assistance. To Swamiji, religion was the basis of human life. Religion is the manifestation of the divinity already in man. Vivekananda categorically pointed out that the freedom of people from want of daily bread was the first condition of national regeneration of India. Swami Vivekanand's analysis of the causes of poverty of the Indian masses stemmed from his own experience when he moved from one part of India to another as paribrajak prior to his leaving for Chicago. He highlighted two major factors responsible for the extreme poverty of the Indians. One, the exploitation of the Indians by the British imperialist regime resulting in the lack of income of the people, and two, the exploitation and repression of the poor farmers, labourers and the ordinary people by the feudal lords, zamindars and priests. His main prescription for ameliorating the condition of the poor was an all-out effort to educate them. Education was essential for them to resist and also to get rid of the oppression and exploitation that they had been subjected to. He advised the youth, "Try to get up a fund, buy some magiclanterns, maps, globes, etc. and some chemicals. Get every evening a crowd of the poor and low……and lecture to them about religion first, and then teach them through the magic- lantern and other things, astronomy, geography, etc. in the dialect of the people. Train up a band of fiery young men. Put your fire in them, and gradually increase the organization, letting it widen and widen its circle. Do the best you can, do not wait to cross the river when the water has all run down".

Swami Vivekananda thought that the solution of the problem of poverty lay in science and technology. He suggested for wide use of western science and technology to create an industrial revolution in the country. He had seen how the West had won its battle against poverty through the use of science and technology. He observed that Japan also had done the same trick. He wanted that in fighting poverty India should follow the footsteps of the West. He didn't want any ready-made solutions. He determined solutions with regard to history and circumstances. Each and every country had to tackle its problems according to its own way and intellect.

According to Swamiji, the rejuvenation of India was primarily a process of spiritual rejuvenation and this spiritual rejuvenation should be supported by massive programmes of economic development. To solve this twin purposes, he propagated the idea of practical Vedanta that helped in the material and spiritual development of the masses. The major implications of practical Vedanta are: (i)Development of spirituality or the potential of divinity present in the human being, (ii) Ethics as an approach to the realization of this divinity, (iii) Education as a mean for the integrated development of man and (iv)Positive Secularism. Swamiji may not have any formal training in economics but as a traveler he came in close touch with cultivators and laborers. Swamiji strongly believed that to ameliorate the depressed economic conditions of the people it was necessary to attack the problems both from the economic and religious angles. Poverty is not just an economic problem, but a social problem too. For inclusive growth equal distribution of wealth is necessary. Swamiji's vision of economics was concerned with wholesome development of all categories of people including weaker sections and women. Everyone should have equitable access to inputs like health, education, physical infrastructure, law and order, financial products, marketing networks, information and technology.

Swamiji had great understanding of the rural development as well as agricultural development of the country. He felt that India has inherent strength in Agriculture. He was in favour of commercialization of agriculture for improving the income of the farmers. The size of Indian farms was small due to sub-

divisions and fragmentations of lands. Hence the economic prosperity of agriculture had to be brought about by cultivating those small sizes. Swamiji realized that illiteracy of our farmers was the greatest drawback in our quest for rural economic prosperity. Hence he proposed top priority to education. Swamiji sincerely believed that education would enable the poor farmers to preserve their rights and privileges. The poor farmers in India were victimized because they were illiterate, ignorant and apathetic towards their misfortunes. Proper education is the chief and only remedy.

Swami Vivekananda felt the needs of industrialization of the country. He understood that the proper utilization of the vast natural resources is needed for industrial development. He also favoured simultaneous development of both agriculture and industry. He thought that imports of many consumer goods could be minimized and a number of goods could be exported abroad if India gave stress on developing the manufacturing industries. Swami Vivekananda's ideas in this regard were well expressed in his interactions with Jamshedji Tata while both of them were co-passengers in the same ship when Swamiji was on his journey to America to attend the Parliament of Religions in Chicago in 1893. He asked Tata why he had imported matches from Japan to sell the same in India instead of producing it in the country so as to check the outflow of money from the country and also to pave the way for employment of the indigenous workers in its production. Vivekananda also advised him to set up new industries in India. Swamiji was interested in industries because he knew that India would be able to rise only by mastering Western technology. After his return to India he took initiative of starting the industries in different parts of country as one of the objectives of Ramakrishna Mission. Swamiji said "If I can get some unmarried graduates, I may try to send them over to Japan and make arrangements for their technical education there, so that when they come back, they may turn their knowledge to the best account for India."

By technical education, Swamiji certainly meant for the use of the modern machineries and techniques. Indeed Swamiji wanted that the material sciences should be mastered by Indians. He said "Machinery in a small proportion is good, but too much of it kills man's initiative and makes a lifeless machine of him...Doing routine work like a machine, one becomes a lifeless machine."

Swami Vivekananda's economic ideas come within the purview of that branch of modern economics known as Welfare Economics. The aim of Welfare Economics is to evaluate economic policies in terms of their effects on the well-being of the community.

Message of Sri Ramakrishna, 'jato mat tato path' taught mankind to believe in all-inclusiveness irrespective of people's social, cultural and spiritual identity. His thought supported plurality of reasons and subjective reality that are the need of the hour in present day Indian context.

Swami Vivekananda stated emphatically that if society is to be reformed, education should be reachedto everyone, high and low, because individuals are the very constituents of the society. The sense of dignity rises in man when he becomes conscious of his inner spirit, and that is the very purpose of education. He strived to harmonize the traditional values of India with the new values brought through the progress of science and technology on the firm ground of our own philosophy and culture.

# The Governing Body of the College for the Session : 2020 – 2022

| | | |
|---|---|---|
| 1. **Hon'ble Justice Mr. G.N. Roy**<br>[Retd. Judge],Supreme Court | BE-265, Salt Lake<br>Kolkata - 700 064 | President |
| 2. **Swami Jayananda** | R.K. Mission Boys' Home<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Secretary |
| 3. **Swami Nirishananda**<br>Principal | R.K. Mission Brahmananda<br>College of Education<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Ex-Officio<br>Asstt. Secretary. |
| 4. **Swami Kaivalyananda** | R.K. Mission Boys' Home<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Member |
| 5. **Swami Kamalasthananda**<br>Principal | R.K. Mission V.C. College<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Member |
| 6. **Swami Muralidharananda**<br>Headmaster | R.K. Mission Boys' Home<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Member |
| 7. **Swami Vedanuragananda** | R.K. Mission Boys' Home<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Member |
| 8. **Dr. Malayendu Dinda**<br>Assistant Professor | R.K. Mission Brahmananda<br>College of Education<br>Rahara, Kolkata - 700118 | Member<br>Teachers'<br>Representative) |
| 9. **Dr. Subir Nag**<br>Principal | Satyapriya Roy College of Education<br>Salt Lake, Kolkata | Member<br>V.C. Nominee |
| 10. **DPI Nominee**<br>(Yet to come) | | Member<br>(Nominee of the<br>DPI West Bengal) |

# The College Staff : 2020 - 2022
# Teaching & Non-Teaching

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Swami Nirishananda** | Principal (Actg.) |
| 2. | **Dr. Kousik Chattopadhyay**, | M.A.(Beng.), P.G.B.T., M.Ed.,Ph.D. - Associate Professor |
| 3. | **Dr. Malayendu Dinda**, | M.A.(Eng.), P.G.C.T.E. & P.G.D.T.E. (Hyderabad) M.Phil., M.Ed.,Ph.D. - Assistant Professor |
| 4. | **Dr. Sanjoy Mitra**, | M.P.Ed.,Ph.D.,DNHE - Assistant Professor |
| 5. | **Sri Prasenjit Mandal** | M.Sc (Zoology), M.A. (Edn.) M. Phil (Edn.) - Assistant Professor |
| 6. | **Dr. Subrata Biswas** | M.Sc. (Physics), M.A. (Edn.) PGDGPC & FT M.Ed., Ph.D. - Assistant Professor |
| 7. | **Sri Miltan Biswas** | M.Sc. (Geography), RS & GIS, M.Ed., M. Phil (Geo) - Assistant Professor |
| 8. | **Abdus Safi** | M.Sc (Maths), M.Ed. - Assistant Professor |
| 9. | **Sri Samrat Bisai** | M.A. (English), M.Ed. - Assistant Professor |
| 10. | **Sri Tusher Kanti Halder** | M.A. (English), M.A. (Edn.) M.Ed. PGDGPC & FT - Assistant Professor |
| 11. | **Sri Manorajan Pal** | M.A. (History), M.Ed. PGDGPC & FT - SACT-II |

**LIBRARY** :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Sri Tapas Biswas** | M.Sc. (Zoo.) MLIS,Lib. Sc., B.T. - Librarian |

**OFFICE :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Sri Subrata Kumar Saha** | B.Com. (Hons.) |
| 2. | **Sri Abhishek Samanta** | M.Sc. (Math) |
| 3. | **Sri Suvojit Chakraborty** | B.Com, (Hons.) |
| 4. | **Sri Sanjay Gharai** | |

**HOSTEL :**

1. **Sri Ramesh Chowdhury**
3. **Sri Bijoy Nayek** (Retd. on 31.12.2021)
4. **Sri Bijoy Krishna Mandal**

''চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি – কর্মের, কমল — ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি – জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি – যোগ এবং জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান – যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয় – চিত্রের ইহাই অর্থ''।

— স্বামী বিবেকানন্দ